উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-সমূহের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর অতিরিক্ত পাঠ্য-পুস্তক।

মুক্তিপথে ভারত

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

গল্প-ভারতীর সম্পাদক ও মাদারের অনুবাদক এবং নূতন যুগের নূতন মানুষ, মেবারের বীরতনয়, শেক্‌স্‌পীয়ারের ট্রাজেডী, শেক্‌স্‌পীয়ারের কমেডী, দুর্গম পথের যাত্রী, হিমালয় অভিযান, মহীয়সী মহিলা, যুগে যুগে, প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক

প্রকাশক—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

১০-বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান :—
বি. সরকার এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মহালয়া, ১৩৫৪

প্রিণ্টার—কার্ত্তিকচন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৯৫, বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

অর্দ্ধ-শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের ফলে আজ ভারতবর্ষ তাহার বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করিতে চলিয়াছে। আজিকার কিশোর-কিশোরীদিগের উপরই এই মহাসম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব। কারণ তাহারাই স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক হইবে। সেইজন্য আজ কিশোর ছাত্রদের পাঠ্য-বিষয়-নির্ব্বাচন জাতির নায়কদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। জাতির এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিকথা প্রত্যেক ছাত্রেরই জানা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা সম্যকভাবে না জানিলে সব-শিক্ষাই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। সেই বৃহৎ অভাব মোচন করিবার জন্যই এই গ্রন্থ লিখিয়াছি। আশা করি, প্রত্যেক শিক্ষক এবং আমার প্রত্যেক ছাত্র-বন্ধু আমার এই উদ্যমকে যথাযোগ্য-ভাবে গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	পনরোই অগাষ্ট	...	১
২।	ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম	...	৫
৩।	স্বাধীনতার আদর্শ—ভারতের যুক্তরাষ্ট্র	...	৮
৪।	রাণী লক্ষ্মীবাঈ	...	১৪
৫।	তান্তিয়া টোপী	...	৩২
৬।	ওয়াহাবী আন্দোলন—সৈয়দ আহ্‌মদ, তিতু মিঞা		৩৯
৭।	এ যুগের প্রথম শহীদ	...	৪৬
৮।	একখানি বইএর কাহিনী	...	৫০
৯।	অরবিন্দ ঘোষ	...	৫৪
১০।	অমর কিশোর ক্ষুদিরাম	...	৬২
১১।	সুরেন্দ্রনাথ	...	৬৭
১২।	রবীন্দ্রনাথ	...	৭৫
১৩।	স্বাধীনতা-সংগ্রামের নূতন রূপ—মহাত্মা গান্ধী		৮২
১৪।	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	...	১০৩
১৫।	মওলানা আবুল কালাম আজাদ	...	১১৪
১৬।	পণ্ডিত জওহরলাল	....	১২০
১৭।	স্বাধীনতা-আন্দোলনের শেষ-সংগ্রাম—সুভাষচন্দ্র		১২৯



প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি বিশেষ দিন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। যে-দিন সেই জাতি তাহার আত্মমর্য্যাদা জগতে প্রতিষ্ঠা করে, তাহার দীর্ঘ জীবনের ইতিহাসে সেই দিনটিকেই সে চিহ্নিত করিয়া রাখে। ঋতুর আবর্ত্তনে সেই একটি দিন যখন বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া আসে, দিব্য অতিথির মতন তাহাকে জাতি পুষ্পে-চন্দনে-অর্ঘ্যে পূজা করে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার সমষ্টিগত জীবন নূতন কর্ম্মে, নূতন প্রেরণায় বর্ষে বর্ষে নিজেকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। সেই একটি দিনের মধ্যে,

জাতির প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে যোগসূত্র নূতন করিয়া অনুভব করে। সেই একটি দিন বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতন আমাদের দেহ-মন-আত্মায় নব-প্রেরণা যোগাইয়া যায়।

যে-দিন ইংলণ্ড হইতে নির্য্যাতিত হইয়া একদল ধর্ম্মপ্রাণ দুঃসাহসিক স্বদেশের মায়া ত্যাগ করিয়া মেফ্লাওয়ার জাহাজে আমেরিকার বন্য অরণ্যে আসিয়া বসবাস স্থাপন করে, সে-দিন তাহাদের সুদূরতম কল্পনায় বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন চেতনাই ছিল না। অরণ্য আর বন্যজন্তুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহারা সেই নূতন দেশে নূতন করিয়া শহর গড়িয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে সেই বিরাট অরণ্যের মধ্যে বলিষ্ঠ এক নবীন জাতি জাগিয়া উঠিল। তারপর বহু বিপদ, বহু আপদ এবং বহু সংঘর্ষের মধ্য দিয়া তাহারা একদা এক বিরাট রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নামে আজ তাহা জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। ৪ঠা জুলাই এই নবীন রাষ্ট্রের জন্মদিন, এইদিন তাহারা তাহাদের নবীন রাষ্ট্রের নামে জগতে স্বাধীনতার এক নূতন আদর্শ প্রচার করিয়াছিল। তাই সারা বৎসরের মধ্যে ঐ একটি দিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসীর কাছে পুণ্যতম দিন বলিয়া পরিগণিত হয়।

৪ঠা জুলাই শুধু যে যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল তাহা নয়, ঐদিন যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে অন্য জাতিদের নিকটও এক নূতন বাণী বহন করিয়া আনে। ভিতর ও বাহিরের বহু বিরুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে সংগ্রাম করিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে তাহার স্বাধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। তাই উক্ত দিনে জাতির জন্ম-পত্রিকায় সেই নবীন রাষ্ট্র রক্তের অক্ষরে লিখিয়া দিল স্বাধিকারের বাণী। স্বাধিকার ও স্বাধীনতা জগতে প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার। এই মহৎ আদর্শের মধ্য দিয়া ৪ঠা জুলাইএর জন্ম হয় বলিয়া, ৪ঠা জুলাই শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে পুণ্যতম

দিবস নয়, বর্ত্তমান সভ্যতার ইতিহাসেও উক্ত দিন চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

তাহার বহু বর্ষ পরে, মিসিসিপির তীর হইতে বহুদূরে, তুষারাচ্ছন্ন রাশিয়ার ভোল্গানদীর তীরে আর একটি পুণ্যতিথি মানুষ নিজের রক্ত দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিল—১৫ই নভেম্বর। উক্ত দিন, দীর্ঘ শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অনাচার এবং স্বার্থান্ধ রাজশক্তির শত অত্যাচার পদদলিত করিয়া রাশিয়ার গণ-চেতনা জগতে আর এক নূতন রাষ্ট্রের জন্মদান করে। সোভিয়েট রাশিয়ার জন্মদিন-রূপে পনরোই নভেম্বর সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেক নবীন অধিবাসীর নিকট পুণ্যতম তিথিরূপে পরিগণিত কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার বাহিরে, সমগ্র জগতের কাছেও, উক্ত দিন একটা বিশেষ সার্থকতা বহন করিয়া আনিয়াছে। একদিন পৃথিবীতে স্বার্থগত এবং সম্পত্তিগত সমস্ত বৈষম্য দূরীভূত হইয়া, বিশ্বব্যাপী কর্ম্মী মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রিত এক কল্যাণ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, পনরোই নভেম্বর সেই আশ্বাস বহন করিয়া আনে। তাই পনরোই নভেম্বর সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্মদান করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসেও এক মহান আশ্বাসের জন্ম দিয়াছে। প্রত্যেক জাতিই আজ বিশ্বকল্যাণ-সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, পনরোই নভেম্বর এই মহৎ আদর্শকে বিশ্ব-চেতনায় স্পষ্টভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

আজ গঙ্গার তীরে, ভারতবর্ষে, ঋতুচক্রের আবর্ত্তনে তেমনি আসিয়াছে পনরোই অগাষ্ট। আড়াইশো বৎসরের পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া লক্ষ বীরের আত্মদানে, ভারতবর্ষ পুনরায় অর্জ্জন করিতে চলিয়াছে স্বাধীনতা। পনরোই অগাষ্ট ভারতবর্ষে এক নূতন রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বিধাতার দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছায় যমজ সন্তানের মতন এই নবীন স্বাধীনতা দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আজও হয়ত এই নবীন রাষ্ট্রদ্বয় শৈশবের আনুষঙ্গিক বিপদ ও বাধা

অতিক্রম করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করে নাই কিন্তু এক বিরাট সম্ভাবনার চেতনা লইয়াই উহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু মানব-সভ্যতার সব চেয়ে সঙ্কট-লগ্নে।

আজ নব-জাগ্রত ভারত তাই নিজের দুঃখ-দৈন্য, ব্যথা-বেদনার মধ্য হইতেই জগৎকে তাহার মহৎ আদর্শের কথা জানাইয়াছে। জানাইয়াছে আত্মঘাতের রক্তাক্ত পথ ত্যাগ করিয়া, কল্যাণের পথে, মানবতার পথে, অহিংসার পথে জগৎকে আজ তাহার চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে; হিংসা নয় প্রেম হইবে জীবনের ধাত্রী; যুদ্ধ নয়, কল্যাণ-ধর্ম্ম হইবে বিশ্ব-জয়ের নূতন মন্ত্র। এবং নব-জাগ্রত ভারতবর্ষ রক্তাক্ত পশ্চিমকে তাহার সমস্ত মদ-মত্ততার বদলে এই মহৎ শিক্ষাই দান করিবে। পনরোই অগাষ্ট সেই নব-আশ্বাস বহন করিয়াই আবির্ভূত হইয়াছে।

যে-সব আত্মজয়ী মহাপুরুষের সাধনায় আজ ভারতবর্ষ তাহার আত্মসম্বিৎ ফিরাইয়া পাইয়াছে, যাঁহাদের ত্যাগে, যাঁহাদের মৃত্যু-ব্রতে আজ আমরা স্বাধীন জীবনের মুক্ত আনন্দ ভোগ করিতে চলিয়াছি, তাঁহাদের অপরূপ জীবনের কাহিনী ভারতের নবীনতম সংহিতা। বহুদিনের সাধনায়, বহুজনের ত্যাগে যাহা অর্জ্জন করিয়াছি, সকলের সম্মিলিত কর্ম্মশক্তিতে, নিত্যজাগ্রত শুভবুদ্ধিতে তাহাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে। সেই বিরাট দায়িত্ব লইয়াই আজিকার তরুণেরা অগ্রসর হইতেছে ভারতের মুক্তির দিকে, জগতের শান্তির দিকে।



ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম

ইংরাজ-রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে যাহা সিপাহী-বিদ্রোহ নামে পরিচিত, তাহাই হইল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম। ইংরাজ শুধু অস্ত্রের দ্বারাই আমাদের শাসন করে নাই, শিক্ষার দ্বারাও আমাদের সম্মোহিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। তাই আমাদের ইতিহাস ইংরাজের লেখা অসম্পূর্ণ ইতিহাস, বিজয়ী জাতির শোষণ-নীতির সহায়ক ইতিহাস। আজ নূতন করিয়া তাই সেই ইতিহাসকে আমাদের নূতনভাবে রচনা করিতে হইবে।

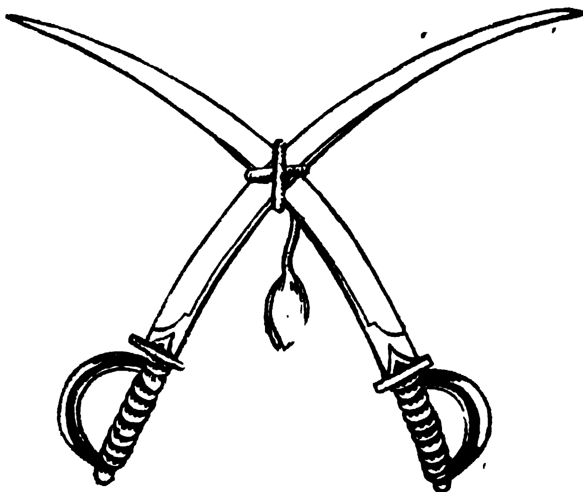
ইংরাজ-ইতিহাস-লেখক প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে-বিদ্রোহ দেখা দেয়, তাহাতে ভারতবর্ষের জনগণের কোন সংযোগ ছিল না, একদল সিপাহী অসন্তুষ্ট হইয়া হাঙ্গামা করিতে চেষ্টা করে, এই মাত্র। সেইজন্য উক্ত আন্দোলনের বা উত্থানের নাম তাঁহারা দেন সিপাহী-বিদ্রোহ।

কিন্তু আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, সে-দিন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বিভিন্ন জাতি বিদেশী শাসনের সেই অপমান, সেই লাঞ্ছনা দূর করিবার জন্য, সকলে মিলিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেই প্রথম চেষ্টা করে। সুতরাং সিপাহী-বিদ্রোহ না বলিয়া, তাহাকে বলা উচিত, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

সে-দিন কন্যাকুমারিকা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মুসলমান একত্র হইয়া, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, বিদেশীর অনিচ্ছুক হাত হইতে দেশের শাসনভার কাড়িয়া লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এবং এই স্বাধীনতা-আন্দোলনের সব চেয়ে বড় কথা হইল, হিন্দু এবং মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সে-দিন সংগ্রাম করিয়াছে, দুই সম্প্রদায়ই সমান আগ্রহে এই ভারতবর্ষকে তাহাদের জন্মভূমি জ্ঞান করিয়া বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছে। কোন হিন্দু মনে করে নাই যে, মুসলমানদের বাদ দিয়া হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে, কোন মুসলমানও ভাবে নাই হিন্দুদের বাদ দিয়া মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে। সকল হিন্দু-নায়ক বিনা দ্বিধায় দিল্লীর শেষ বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্‌কে তাঁহাদের মূল অধিনায়ক স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; সকল মুসলমান-নায়কই, যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, হিন্দু-সেনাপতির অধীন যুদ্ধ করিয়াছেন। এতদিন যে-সব প্রামাণ্য দলিল-পত্র আমরা প্রকাশ করিতে পারি নাই, এখন তাহা পড়িয়া আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, এই প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান কিভাবে একত্র হইয়া এই দেশকে

সেবা করিয়াছিল। এই সংগ্রামের সময় জনগণকে আহ্বান করিয়া দিল্লী হইতে বাহাদুর শাহ্ যে-সব ঘোষণা জারি করেন, তাহা পড়িলে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অস্তিত্বই তখন ছিল না। একটি ঘোষণাতে তিনি বলিতেছেন, "হে হিন্দুস্তানের সন্তানবৃন্দ, এস সকলে সম্মিলিতভাবে, আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়, এই আমাদের জন্মভূমিকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করি!" বেরিলী থেকে ঘোষিত আর একটি ফরমানে বাদশাহ্ আহ্বান করিতেছেন, "ভারতের হিন্দু আর মুসলমান, আর ঘুমাইয়া থাকিও না, উঠ, জাগ…আমাদের এই স্বাধীনতার সংগ্রামে কোন ভেদ নাই, এমন কি উঁচু-নীচুরও ভেদ নাই, কেউ সেনাপতি নয়, আমরা সবাই সৈনিক…সমান আমাদের পদবী…সমান আমাদের সম্মান …স্বদেশের জন্য যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, তাহারা সকলে এক!"

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর, ইংরাজ চেষ্টা করিয়া এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া তোলে, কারণ এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগে তাহারা তাহাদের শাসনকার্য্য অব্যাহতভাবে চালাইতে পারিবে। মানুষের তৈরী এই ভেদবুদ্ধি একদিন মানুষের শুভবুদ্ধিতে আবার দূরীভূত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।



স্বাধীনতার আদর্শ—ভারতের যুক্তরাষ্ট্র

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন একদিন বৃষ্টি-ক্লান্ত এক অপরাহ্ণে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার, তথা ভারতের স্বাধীনতা অন্তর্হিত হয়। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুষ্টিমেয় বণিক-ইংরাজ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, এদেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক দূরবস্থার সুবিধা গ্রহণ করিয়া রাজ্য-বিস্তার করিতে আরম্ভ করে এবং কালক্রমে ইংলণ্ড তাহাদের নিকট হইতে এই নব-অধিকৃত দেশের শাসনভার সমগ্রভাবে লইয়া ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করে।

বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষ দখল করিয়া লয়। তখন দিল্লীর মুঘল-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাহার

সুযোগে ছোট-বড় বিভিন্ন রাজ্য সকলেই স্বতন্ত্রভাবে যে যাহার নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য পরস্পর পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া শক্তিক্ষয় করিতেছিল। ইংরাজ আসিয়া রাজনৈতিক চতুরতা এবং ষড়যন্ত্রের কৌশলে সেই আত্মকলহে ইন্ধন যোগাইল। এক পক্ষের সঙ্গে যোগদান করিয়া অপর পক্ষকে পরাজিত করিল। তাহার পর, সেই বিজয়ী পক্ষকে আবার ভিতর হইতে দুর্ব্বল করিয়া তাহাদের রাজ্য দখল করিয়া লইল। এইভাবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্ষত্রিয়-শক্তি দেখিল, তাহাদের পরস্পরের এই কলহ আর বিচ্ছিন্নতার দরুণ তাহারা নিজেরাই বিদেশীর হাতে তাহাদের এই স্বর্ণভূমিকে তুলিয়া দিয়াছে। যে-দিন ইংরাজ প্রথম এই দেশে আসে, সে-দিন যদি তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহাকে বাধা দিত, নিজেদের বিবাদে বাহির হইতে ইংরাজের সাহায্য যাচিয়া না আনিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের মানচিত্রে কোথাও একটা লালবিন্দু থাকিত না।

ইংরাজ-শাসন যখন সারা দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তখন নিজেদের এই নিদারুণ ভুল সম্বন্ধে তাহারা সজাগ হইয়া উঠিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যে পরাধীনতার জন্ম হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহার আয়ু শতবর্ষ হইয়া আসিতেছিল। সঙ্গোপনে কাহারও কাহারও মনে তখন এক দুরাকাঙ্ক্ষা মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, পরাধীনতার এই আগতপ্রায় শতবার্ষিকী জন্মদিনে তাহারা পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের হৃত স্বাধীনতাকে উদ্ধার করিয়া লইবে। এই রকম একটা কথা তখন প্রধান প্রধান প্রদেশের রাজধানীর গোপন রাজনৈতিক মহলে বাতাসে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই ধূমায়মান অগ্নিকুণ্ডে লর্ড ডালহাউসী আসিয়া ইন্ধন যোগাইলেন। তিনি যে-দিন রাজপ্রতিনিধি-রূপে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, সে-দিনও উত্তর ভারতে পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিং বৃটীশের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এই বীর যোদ্ধা লেখাপড়া জানিতেন না কিন্তু তাঁহার শক্তি ও

সাহস যেমন ছিল, তেমনি ছিল তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভা। একবার বৃটীশ-কৃত ভারতবর্ষের এক মানচিত্র দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই-সব দেশ লালরঙে চিহ্নিত হইয়াছে কেন? একজন সভাসদ্ তাহার উত্তরে জানান, যে-সব অঞ্চল ইংরাজ-অধিকৃত সেই-সব অঞ্চল লালরঙে চিহ্নিত করা হইয়াছে। তাহা শুনিয়া ভারতবর্ষের মানচিত্রে তখনও পর্য্যন্ত যে সামান্য জায়গাটুকু লালরঙে চিহ্নিত হয় নাই, তাহার দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রণজিৎ সিং বলিয়াছিলেন, "সব্ লাল্ হো যায়্গা!"

তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী লর্ড ডালহাউসী আসিয়া সার্থক করিয়া তুলিলেন। ভারতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবের দিকে চাহিয়া এই দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদী বলিয়াছিলেন, "সমগ্র হিন্দুস্তানকে আমি সমতল করে দেবো!"

এবং দিয়াও ছিলেন। ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চারিদিকে সবাই পিঞ্জরাবদ্ধ, তাহার মধ্যে একমাত্র রণজিৎ সিং সিংহের মত কেশর ফুলাইয়া স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই বিসদৃশ ব্যাপার তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি স্থির করিলেন, পাঞ্জাব-কেশরীকে আগে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে হইবে। চিলিওয়ানওয়ালার প্রান্তরে সিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে গিয়া বৃটীশ-সিংহের বাহন পাঞ্জাব-সিংহের থাবায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এক বিশ্বাস-ঘাতকের সহায়তায় লর্ড ডালহাউসী অতর্কিতে রণজিৎ সিংকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ লাল হইয়া গেল। রণজিৎ সিংএর মহিষী চাঁদ কুয়ার বৃটীশের অনুকম্পার ব্যর্থ আশায় লণ্ডনে শুকাইয়া মরিলেন। সিংহ-শিশু ধুলিপ সিংকে ফিরিঙ্গীর হাতের মুষ্টিভিক্ষায় জীবন-ধারণ করিয়া থাকিতে হয়।

যে-অসন্তোষ ধূমায়মান হইয়া উঠিতেছিল, এই ব্যাপার তাহাতে অনেকটা ইন্ধন যোগাইল। তাহার উপর, ডালহাউসীর নূতন রাজনীতি

ভারতবর্ষের পরাধীন রাজাদের চোখ খুলিয়া দিল। দেশীয় রাজ্য বিনা যুদ্ধে দখল করিয়া লইবার জন্য ডালহাউসী একটি চমৎকার আইনের সৃজন করিলেন। কোন রাজ্যের রাজা যদি অপুত্রক মরিয়া যান, তাহা হইলে সে-রাজ্য সোজা বৃটীশের শাসনে চলিয়া আসিবে। কোন রাজা যদি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন, গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বৃটীশের যথারীতি অনুমতি লইতে হইবে। নতুবা তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এই উদার নীতি অনুসরণ করিয়া ডালহাউসী একে একে সাতারা, নাগপুর প্রভৃতি স্বনামখ্যাত হিন্দুরাজ্য দখল করিয়া লইলেন। নাগপুরের প্রাসাদে ইংরাজ-সৈন্যরা প্রকাশ্যে যে-বর্ব্বরতার অনুষ্ঠান করিল, তাহাতে ভারতবাসী সচকিত হইয়া উঠিল। রাজহস্তীর পৃষ্ঠ হইতে রাণীদের বলপূর্ব্বক নামাইয়া দিয়া প্রকাশ্য বাজারে সেই-সব হাতী তাহারা নিলামে বিক্রয় করিল। মাত্র একশো টাকায় এক একটা হাতী বিকাইয়া গেল। যে-অশ্ব স্বয়ং নরপতিকে বহন করিত, মাত্র পাঁচ টাকায় তাহা বিক্রীত হইয়া গেল। এইভাবে প্রাসাদের সমস্ত স্বর্ণ-রৌপ্য-সামগ্রী, অন্তঃপুরবাসিনী রাজমহিলাদের অঙ্গ হইতে প্রত্যেকটি হীরা-মণি-মুক্তা তাহারা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া লোষ্ট্রখণ্ডের মত বিকাইয়া দিল। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে রাণীদের শয়নকক্ষের মাটী খুঁড়িয়া দেখিল, সেখানে কোন গুপ্তধন লুক্কায়িত আছে কিনা। যখন উন্মত্ত সৈনিকেরা এইভাবে খননকার্য্যে ব্যস্ত তখন পাশের ঘরে মহারাণী অন্নপূর্ণা বাঈ মৃত্যুশয্যায় অসহায়া পড়িয়া আছেন। এই সমস্ত অনাচারের একমাত্র কারণ, রঘোজীর অপরাধ তিনি অপুত্রক মরিয়া গিয়াছেন।

(এই সমস্ত অনাচারের ফলে ধীরে ধীরে যে-অসন্তোষ ভারতের হৃতগর্ব্ব, রাজ্যচ্যুত নরপতি আর সেনা-নায়কদের মনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা ক্রমশঃ একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিল।) দিল্লীতে শেষ মুঘল-সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্ এবং বিঠুরে পেশোয়ার বংশধর

নানাসাহেব, পরস্পরের সঙ্গে গোপন আলোচনা শুরু করিয়া দিলেন। (এই দুই মহাপুরুষ সে-দিন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান এক পতাকার তলায় যে-দিন সমবেত হইবে, সে-দিন হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা কেহ আর আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না) সমস্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড শক্তিকে, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে হিন্দুস্থানের এক পতাকার তলায় সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ভারতের যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। সম্মুখেই আসিতেছে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ, পলাশীর পরাজয়ের শতবার্ষিকী। এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাহারা হিন্দু-মুসলমান সমবেত হইয়া এক পতাকার তলে, এক সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আদর্শ লইয়া বিদেশী বৃটীশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে। কংগ্রেস যে-আদর্শের জন্য "কুইট ইণ্ডিয়া"-প্রস্তাব গ্রহণ করে, সে-দিন নানাসাহেব আর বাহাদুর শাহ্, হিন্দু আর মুসলমান-শক্তির দুই সুযোগ্য প্রতিনিধি, স্পষ্টাক্ষরে সেই আদর্শকেই প্রথম প্রত্যেক ভারতবাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন। সেই উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য নানাসাহেব সারা ভারতবর্ষে গুপ্তচর প্রেরণ করেন। এই-সব গুপ্তচর কখনও সন্ন্যাসীর বেশে, কখনও ভিক্ষুক সাজিয়া, কখনও বা দৈবজ্ঞের বেশে ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের দরবারে, সিপাহীদের কেল্লায়, তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরিয়া বেড়ায়। যেখানে যেখানে বৃটীশের কেল্লা ছিল, সেখানে দেশী সিপাহীদের তাঁবুতে গিয়া তাহারা তাহাদের মধ্যে বাস করিত এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করিত। গঙ্গাবক্ষে দাঁড়াইয়া হিন্দু-সিপাহীরা শপথ গ্রহণ করিল, কোরাণ স্পর্শ করিয়া মুসলমান-সিপাহীরাও শপথ করিল, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তাহারা বিদ্রোহে যোগদান করিবে। এইভাবে, যতই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ আগাইয়া আসিতে লাগিল, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই গোপন প্রচারকার্য্যের ফলে সিপাহীরা আগতপ্রায় বিদ্রোহের জন্য ততই প্রস্তুত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই গোপন বিদ্রোহী দলের দুইটি চিহ্ন ছিল, রক্তপদ্ম আর রুটি। এক তাঁবু হইতে আর এক তাঁবুতে এই রক্তপদ্ম পাঠানো হইত। যদি সেই তাঁবুর সিপাহীরা সেই রক্তপদ্ম গ্রহণ করিত, তাহা হইলে বোঝা যাইত যে তাহারা সেই গোপন দলে যোগদান করিল। তখন একখানি রুটি টুকরো টুকরো করিয়া তাহারা সকলে গ্রহণ করিত, তাহাদের সম্মিলিত সাধনার প্রতীকস্বরূপ। (এইভাবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের উষাকালে সমগ্র ভারত এক নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে এবং হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে ভারতের সেই প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামে জাগিয়া উঠে।) তাই সিপাহী-বিদ্রোহ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। কংগ্রেসের সম্মুখে যে লক্ষ্য, সেই একই লক্ষ্য তাহাদের সম্মুখে ছিল, হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত সাধনার ফল, ভারতের যুক্তরাষ্ট্র।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে বহু নাম বিজড়িত হইয়া আছে। সেই সংগ্রামের বহু নায়কের নাম আমরা জানিও না আবার। বহু লোকের আত্মত্যাগে, দুঃখবরণে, যেমন একদিকে এই সংগ্রামের স্মৃতি সুপবিত্র হইয়া আছে, তেমনি উভয় পক্ষের বহু অনাচার ও অত্যাচারের নির্ম্মমতায় ইহা কলঙ্কিতও হইয়া আছে।

কিন্তু এত আয়োজন, এত বীরত্ব এবং আত্মোৎসর্গ সত্ত্বেও এই প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা পরাজিত হই, তাহার মূল কারণ হইল, এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে সে-দিন জনগণের চেতনা প্রকৃতপক্ষে উদ্বুদ্ধ হয় নাই। ইহা সে-দিন সাধারণতঃ সৈনিক-দল এবং সমাজের উচ্চস্তরের নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল



রাণী লক্ষ্মীবাঈ

তখন পেশাওয়াদের শেষ প্রতিনিধি বাজীরাও সিংহাসনচ্যুত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম শতকে বিঠুরে গঙ্গার ধারে নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। তাঁহার দেখাদেখি বহু সম্ভ্রান্ত মারাঠা পরিবার স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এইসময় চলিয়া আসেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন মোরাপন্ত তাম্বে এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভাগীরথীবাঈ। এক সময় পেশাওয়ার দরবারে মোরাপন্তের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল কিন্তু মারাঠার সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও জীবনে নিদারুণ দুর্দ্দশা নামিয়া আসে। স্বদেশের মায়া ত্যাগ

করিয়া পুণ্যধাম বারাণসীতে আসিয়া তাঁহারা দেবার্চ্চনায় কোন রকমে দিনাতিপাত করিতেছিলেন।

পিছনের দিকে, মারাঠার অস্ত-গগনের দিকে চাহিয়া মোরাপন্তের অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তাঁহার আর একটি বিশেষ বেদনার কারণ ছিল, তাঁহাদের কোন সন্তানই হয় নাই। প্রতিদিন উষাকালে আবক্ষ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া ঈশ্বরের নিকট সকাতর নিবেদন জানাইতেন, যেন মারাঠার দুঃখদিন দূরীভূত হয়, এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদে তাঁহার শূন্য গৃহে যেন এমন একটি সন্তানের আবির্ভাব হয়, যাহার উপর নিশ্চিন্ত মনে সেই মহাকার্য্যের দায়িত্বের ভার সমর্পণ করিয়া দিয়া তাঁহারা তৃপ্ত অন্তরে এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারেন।

অবশেষে একদিন ঈশ্বরের কৃপা সত্যই তাঁহার উপর বর্ষিত হইল। তাঁহার অন্ধকার ঘর আলো করিয়া একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। হউক কন্যা, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ জানিয়া তাহাকেই পুত্রের মতন করিয়া মোরাপন্ত লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কন্যার নাম রাখিলেন মানুবাঈ।

মানুবাঈ যখন তিন-চার বৎসরের শিশুমাত্র, সেই সময় মোরাপন্ত সপরিবারে বারাণসী হইতে বাজীরাওএর প্রাসাদে চলিয়া আসিলেন। বাজীরাও মারাঠার সেই পুরাতন সেবককে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং মানুবাঈএর অসাধারণ শৈশব-লাবণ্য এবং দীপ্তি দেখিয়া তাহাকে নিজের অন্তঃপুরে নিজের কন্যার স্থান দান করিলেন। এইভাবে মানুবাঈ সামান্য গৃহস্থের ঘর হইতে রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এইখানে মানুবাঈ তাঁহার ক্রীড়াসঙ্গীরূপে একজন বালককে পাইলেন। তখন কেই বা জানিত, ভাগ্য সেই যে দুইটি বালক-বালিকাকে সে-দিন একত্র এক জায়গায় মিলিত করিয়া দিল, তাহার মধ্যে ভারতের ভাগ্য-

বিধাতার এক গূঢ় নির্দ্দেশ লুক্কায়িত ছিল কারণ সেই বালক-বালিকাই বড় হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুইজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়করূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সেই বালিকা মানুবাঈ হইলেন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, আর তাঁহার বালক ক্রীড়াসহচর হইলেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়ক নানাসাহেব, যাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে পরবর্ত্তী কালে ফিরিঙ্গী বিদেশীর অন্তর আতঙ্কিত হইয়া উঠিত। দৈব তাঁহাদের সেই শৈশব-ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে একত্র মিলিত করিয়া দিল।

মোরাপন্তের মতন, মাধবরাও নারায়ণ ভাটও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বাজীরাওএর সঙ্গে বিঠুরে চলিয়া আসেন। সেখানে তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী গঙ্গাবাঈ বাজীরাওএর প্রদত্ত সামান্য বৃত্তিতে অতি সাধারণ গৃহস্থের মতন জীবন-যাপন করিতেন। বহু দেবদেবীর আরাধনার ফলে তাঁহাদের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, পুত্রসন্তান। সেই পুত্রেরই নাম নানা-সাহেব।

মাধবরাও মাঝে মাঝে শিশু-পুত্রকে সঙ্গে করিয়াই বাজীরাওএর দরবারে আসিতেন। অপুত্রক বাজীরাও সেই শিশুকে দেখিয়া এবং তাহার ভাব-ধরণ লক্ষ্য করিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়া যান যে, তিনি তাহাকে নিজের দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিবার কথা মাধবরাওকে জানান। মাধবরাও পুত্রের সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া নিজেকে বঞ্চিত করিয়া পুত্রকে বাজীরাওএর হাতে তুলিয়া দিলেন। বাজীরাও তাহাকে নিজের পুত্ররূপে যথা-অনুষ্ঠানে গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে বালক রাজ-প্রাসাদে রাজকুমারের ন্যায় লালিত-পালিত হইতে লাগিল এবং সেই শৈশবকাল হইতেই মহারাষ্ট্রের প্রথা অনুযায়ী ক্ষাত্রবিদ্যায় শিক্ষা পাইতে লাগিল। এই সময় বারাণসী হইতে মানুবাঈ আসিয়া তাঁহার ক্রীড়াসহচরী হইলেন। তাঁহারা দুইজনে ভাই-বোনের মত একই সঙ্গে একই শিক্ষা পাইতে লাগিলেন।

রাজপ্রাসাদে আসিয়া মানুবাঈএর একটি নতুন নামকরণ হইল, চামেলী। চামেলী ফুলের মত শুভ্র, সুন্দর, সুরভিত সেই শিশু-কন্যাকে যে দেখিত, সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাই পরিবারের সকলে তাহাকে আদর করিয়া চামেলী বলিয়া ডাকিত।

চামেলী আর বালক নানা একই সঙ্গে খেলিত, একই সঙ্গে পড়িত এবং বালিকা হইলেও মানুবাঈ বালকের সঙ্গে তাহার যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষাতেও সমান অংশ গ্রহণ করিত। তাহারা একসঙ্গে দুইজনে অসি-চালনা, অশ্বারোহণ, ব্যায়াম, ইত্যাদি অভ্যাস করিত। এবং একই গুরুর নিকট প্রভাতে, সন্ধ্যায় নিজেদের জাতির অতীত কীর্ত্তির কথা, হৃতমহিমার কথা শ্রবণ করিত। শ্রবণ করিতে করিতে দু'জনারই অন্তঃকরণ একই আদর্শে, একই অনুপ্রেরণায় অনুরণিত হইয়া উঠিত, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য জীবন-উৎসর্গ করিবার দুঃসাধ্য ব্রত একই সঙ্গে গ্রহণ করিত। এই ভাবে, সেদিন যখন ভারতবর্ষ শৃঙ্খলের পর শৃঙ্খল পরিতেছিল, সেই সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা এই দুইটি বালক-বালিকাকে সেই শৃঙ্খল-মোচনের কঠোর সাধনার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে মানুবাঈ অসি-চালনায়, অশ্বারোহণে কিশোর নানার সমকক্ষ হইয়া উঠিল। দুইজনে প্রায়ই অশ্বারোহণের প্রতিযোগিতা করিত, কখন মানুবাঈ জিতিত, কখন নানা জিতিত। সেই অল্প বয়সেই মানুবাঈ মাহুতকে সরাইয়া দিয়া হাওদায় চড়িয়া হস্তী পরিচালনা করিত। তাহার সেই তেজোদীপ্ত কিশোরী মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে বিমুগ্ধ হইয়া যাইত।

বাংলা দেশের মতন, মহারাষ্ট্রেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব আছে। সেখানে এই উৎসবের নাম যমদ্বিতীয়া। এইদিন ভগ্নী ভ্রাতার অক্ষয় জীবন কামনা করিয়া তাহার কপালে চন্দন-তিলক পরাইয়া দেয়। প্রতি বৎসর

মানুবাঈ নানাসাহেবের কপালে চন্দন-তিলক দিত, মৃত্যুর দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত, ভ্রাতার অক্ষয় আয়ু, কীর্ত্তিমান্ অস্তিত্ব। সেদিন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, একদিন প্রকৃত জীবনের ক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইয়া, দুইজনে দুইজনার জীবনের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হইবে।

তাঁহাদের এই শৈশবের বন্ধুত্ব সহসা ছিন্ন হইয়া গেল। অতি অল্প বয়সেই সেকালের প্রথা অনুযায়ী মানুবাঈএর বিবাহ হইয়া গেল। ঝাঁসীর নৃপতি, মহারাজা গঙ্গাধর রাও বাবা সাহেবের সহিত মানুবাঈএর শুভ-পরিণয় সংঘটিত হইয়া গেল। মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ-রূপে তিনি ঝাঁসীর সিংহাসনের বাম পার্শ্বে বসিলেন এবং ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-রূপেই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। স্বামীর সিংহাসনে পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তিনি নিয়মিত রাজকার্য্যে স্বামীকে সহায়তা করিতেন। সেই বালিকা-বয়সেই তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া দরবারের কর্ম্মচারীরা বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। প্রজারাও সেই অল্পবয়সী রাণীর ব্যক্তিত্বে এবং স্নেহে তাঁহাকে জননীরূপে শ্রদ্ধা জানাইত।

কিন্তু এত সুখের মধ্যে, তাঁহার অন্তরে একটি বিশেষ দুঃখ ছিল। তাঁহার কোন সন্তান হইল না। তাঁহার মাতৃহৃদয় পুত্রস্নেহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং তিনি তাঁহার প্রজাদের মধ্য হইতে একটি সুলক্ষণ বালককে তাঁহার দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। সেই পুত্রের নাম রাখিলেন দামোদর।

যখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠারো বৎসর, সেই সময় সহসা তাঁহার স্বামী পরলোকগমন করিলেন। তাঁহার সুখের জীবনে ঘন-অন্ধকার নামিয়া আসিল। এই সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন অবিচ্ছেদ এক সংগ্রামের জীবন। সেই একান্ত তরুণ বয়সে, চারিদিকের প্রাণান্তকারী সব সমস্যার বিরুদ্ধে নারী হইয়া তিনি যেভাবে নিজেকে পরিচালিত

করেন, তাহাতে তাঁহার নাম জগতের শ্রেষ্ঠ নারীদের সহিত সমানে উচ্চারিত হয়। ভারত-নারী, প্রয়োজন হইলে যে কতখানি শক্তি, কর্ম্মতৎপরতা এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারে, রাণী লক্ষ্মীবাঈএর জীবন হইল তাহার আদর্শ উদাহরণ। সেইদিক হইতে, উনবিংশ শতাব্দীর এই ভারত-নারী, বিংশ শতাব্দীর আধুনিকা ভারত-নারীর প্রকৃত জননী, তাহার আদর্শ ও প্রেরণা। রাণী লক্ষ্মীবাঈএর দিকে চাহিয়া, ভারত-নারী অকুণ্ঠ চিত্তে বলিতে পারেন, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে, ভারতের পুরুষদের মতনই আমাদেরও সাধনার দান আছে এবং ভারত-নারী কোন দৌর্ব্বল্যের অজুহাতে স্বাধীনতার সংগ্রামে, তাহার দেশের মুক্তির সাধনায় পিছাইয়া পড়িয়া থাকে নাই, থাকিবেও না।

গঙ্গাধর রাওএর সহসা মৃত্যুতে রাজ্যের সমস্ত ভার লক্ষ্মীবাঈএর উপর আসিয়া পড়িল। নাবালক পুত্র দামোদরকে পাশে রাখিয়া তিনি নিজের ব্যক্তিগত সমস্ত শোক ভুলিয়া যথারীতি রাজ্য-পরিচালনা করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রী-দিগের সহিত আলোচনা করিয়া স্বহস্তে রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব পালন করিতে লাগিলেন।

এই সময় লর্ড ডালহাউসীর নীতি অবলম্বন করিয়া ইংরাজ-সরকার একে একে দেশী রাজ্যগুলিকে আত্মস্থ করিয়া লইতেছিল। গঙ্গাধর রাওএর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহারা রাণী লক্ষ্মীবাঈকে জানাইল, যেহেতু ঝাঁসীর পরলোকগত শাসক পুত্রহীন অবস্থায় মারা গিয়াছেন, সেইহেতু ঝাঁসী-রাজ্য অতঃপর ইংরাজদের প্রত্যক্ষ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইবে। দামোদরকে দত্তক পুত্ররূপে তাহারা স্বীকার করিবে না। অতএব পত্রপ্রাপ্তিমাত্র, রাণী লক্ষ্মীবাঈ যেন ঝাঁসীর দুর্গ ছাড়িয়া দেন, ঝাঁসী-দুর্গে ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া বাস করিবে।

সেই পত্র পাইয়া বীর-নারীর অন্তর দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

রাজ-অসি মুক্ত করিয়া সিংহিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "মেরী ঝাঁসী দুঙ্গী নেহি!"

ইংরাজ-দূত সেই দীপ্ত প্রতিবাদ লইয়া ফিরিয়া গেল। রণ-দামামার ঝঙ্কার তুলিয়া সেই বীর যুবতী রাজ্যের প্রজা এবং প্রজাদের প্রতিনিধিদের ডাকিয়া তাঁহার অন্তরের বাসনার কথা জানাইলেন, জীবন দিব, তবুও ইংরাজের দাসত্ব স্বীকার করিব না!

সেই তরুণী নারীর সেই বিজয়দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া প্রজারাও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। সৈনিকের বেশে তিনি স্বয়ং সেনাপতি হইয়া ঝাঁসীর সৈন্যদের লইয়া ঝাঁসী-রাজ্য হইতে ইংরাজদের বিতাড়িত করিয়া দিলেন। যাহারা প্রাণভয়ে পলাইল, তাহারা বাঁচিল। অবশিষ্ট প্রাণ দিতে বাধ্য হইল।

পলাশীর পরাজয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে, ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজদের বিতাড়িত করিবার যে আয়োজন চলিতেছিল, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহা চারিদিক হইতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কলিকাতার নিকট বারাকপুরে প্রথম দেশী সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে সারা উত্তর ভারতে তাহা দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে। সমস্ত উত্তর ভারতের মাটী রক্তে লাল হইয়া উঠিল। প্রথম আক্রমণে ইংরাজরা সব জায়গা হইতে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা তাহাদের সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া বিদ্রোহীদের ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল। এবং তাহাদের এই উদ্যোগে সেই সময়, ভারতবর্ষেরই বহু রাজা নিজেদের স্বার্থের লোভে স্বজাতির বিরুদ্ধে ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করিল। চতুর ইংরাজ তাহার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিল।

ঝাঁসী হইতে ইংরাজদের বিতাড়িত করিয়া দিয়া রাণী লক্ষ্মীবাঈ স্বামীর পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসিয়া যথারীতি রাজ্যশাসন করিতেছিলেন।

তখন তাঁহার বয়স মাত্র একুশ বৎসর। সেই তরুণ বয়সেই রাজ্য-পরিচালনার ব্যাপারে তিনি যে-কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহাতে ইতিহাসে আদর্শ শাসকদিগের সহিত তাঁহার নাম উচ্চারিত হইতে পারে। ঐশ্বর্য্য এবং সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়া, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যান নাই যে, মানুষ হিসাবে তাঁহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব তাঁহার সকল প্রজাদের অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। সিংহাসন সকলের চেয়ে উচ্চপদ বটে কিন্তু তাহার দায়িত্বও সকলের উচ্চে। তাই তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে দেখি, একটা কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং কর্ম্মনিষ্ঠা। নিজের মন্ত্রি-সভা বা পাত্রমিত্রের উপর সকল কর্ম্মভার নিশ্চিন্তে ছাড়িয়া দিয়া, যে শাসক শুধু ভাগ্যদত্ত কুসুম-শয্যায় শায়িত হইয়া ঐশ্বর্য্য উপভোগ করে, এই তরুণী মারাঠা-নারী তাহাদের দলের সম্পূর্ণ বাহিরে ছিলেন। ঝাঁসার অধিকাংশ প্রজা যখন প্রভাত-শয্যার উষ্ণতা উপভোগে উপাধান জড়াইয়া থাকিত, ঝাঁসীর রাণী তখন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা-ত্যাগ করিয়া দিবসের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিতেন। সুগন্ধ স্নান-জলে স্নান সমাপন করিয়া, দুগ্ধশুভ্র মান্দেরা সাড়ী পরিধান করতঃ নিত্য-পূজায় বসিতেন। বিধবার রীতি অনুযায়ী তিনি তাঁহার কেশ মুণ্ডন করেন নাই, সেই ত্রুটির জন্য প্রতিদিন পূজার প্রথমে তিনি পরলোকগত স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইতেন, তারপর তুলসী-মঞ্চের নিকটে গিয়া তুলসী-বৃক্ষে জলদান করিতেন। তারপর, “পার্থিব পূজায়” বসিতেন, এই পূজার সময় নির্দ্দিষ্ট বৈতালিকগণ নেপথ্য হইতে বহুবিধ বাদ্য বাজাইত। পূজা-অন্তে পুরাণ-পাঠ হইত। কখনও নিজে পড়িতেন, কখনও বা পৌরাণিক পণ্ডিতগণ পড়িতেন। এই ভাবে তাঁহার প্রভাতী পূজা নিষ্পন্ন হইত। তিনি যে শুধু অভ্যাসবশতঃ এই ধর্ম্মাচরণ করিতেন, তাহা নয়, এই ধর্ম্মায়োজনের মধ্য হইতে তাঁহার সেই তরুণ-বৈধব্যের নিঃসঙ্গতার বেদনা দূর করিয়া শক্তি সংগ্রহ করিতেন। ধর্ম্ম-

কার্য্য শেষ হইলে, একে একে দরবারের কর্ম্মচারীরা প্রভাতে তাঁহাকে প্রথম-দর্শন করিতে আসিতেন। তাহার মধ্যে কেহ যদি অনুপস্থিত হইত, অমনি তাহা তাঁহার লক্ষ্যে পড়িত এবং তিনি অনুপস্থিতির কারণ জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন। এই ব্যাপারটিতে তাঁহার অন্তরের অসাধারণ গুণের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়, যখন আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহার কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল সাড়ে সাতশো। এই সাড়ে সাতশো জনের প্রত্যেককে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনিতেন। এই ভাবে দরবার-পরিদর্শন শেষ হইলে, তিনি প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেন এবং কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ না থাকিলে একঘণ্টা কাল বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। বিশ্রামান্তে তাঁহার সম্মুখে প্রভাতে প্রজারা যেসব উপহার দিয়া যাইত, তাহা আনয়ন করা হইত। তাহার মধ্য হইতে দু'একটি দ্রব্য নিজের জন্য রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট উপহার তিনি কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। এই ভাবে দ্বিপ্রহর আগাইয়া আসিত। তখন তিনি রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য দরবারে উপস্থিত হইতেন। সাধারণতঃ দরবারে থাকিবার সময় তিনি পুরুষের বেশ ধারণ করিতেন, দীর্ঘ পায়জামা, ঘননীল কোট, মাথায় পাগড়ী, ক্ষীণ কটিতে মণি-মুক্তাখচিত রঙীন দোপাট্টি, তাহা হইতে বিলম্বিত থাকিত তরবারি। তিনি সকলের সমক্ষে দরবারে বসিতেন না। দরবারের একধারে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র একটি প্রকোষ্ঠ থাকিত। তাহাতে একা বসিয়া তিনি রাজকার্য্য করিতেন। গৃহের বাহিরে প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্মণরাও দেওয়ানজী রাজ্যের কাগজ-পত্র লইয়া অপেক্ষায় থাকিতেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যের যাবতীয় ব্যাপার তিনি নিজেই পরিচালনা করিতেন। তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং বিবেচনা দেখিয়া বৃদ্ধ অমাত্যগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া যাইতেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় আদেশগুলি তিনি স্বহস্তেই লিখিতেন। দরবারের কার্য্য

শেষ হইলে তিনি পুনরায় পূজারিণীর বেশ ধারণ করিতেন এবং প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী কৃত্রিম হ্রদের ধারে মহালক্ষ্মীর মন্দিরে গিয়া দেবীর সায়ংপূজা করিতেন। একদিন পূজা-অন্তে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, দেখেন, অসংখ্য লোক প্রাসাদ-সম্মুখে সমবেত হইয়াছে এবং প্রাসাদ-প্রহরী তাহাদের বিতাড়িত করিয়া দিতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রধান-মন্ত্রীকে ডাকিয়া কি ব্যাপার তাহা জানিতে চাহিলেন। প্রধানমন্ত্রীর নিকট শুনিলেন, রাজ্যের দরিদ্র প্রজা এবং ভিখারীরা সামনের শীতে বস্ত্রাভাবে বড়ই কষ্ট পাইবে, তাহা তাহাদের রাণী-মাকে জানাইতে আসিয়াছে। রাণী লক্ষ্মীবাঈ তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রীকে আদেশ দিলেন, রাজ্যের দরিদ্র প্রজাদের ঘোষণা দ্বারা জানাইয়া দিতে যে আগামী সপ্তাহে রাজকোষ হইতে প্রত্যেকেই শীতবস্ত্র পাইবে।

এই ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট একটা কর্ম্মব্যবস্থার মধ্য দিয়া সেই তরুণী মারাঠা-নারীর প্রত্যেকটি দিন অতিবাহিত হইত। ইতিহাসে রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর বীরত্বের কাহিনীই বড় করিয়া ঘোষিত হয় কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে যে-আদর্শনিষ্ঠা, যে-কর্ম্মপ্রীতি আমরা দেখিতে পাই, তাহা কম উল্লেখযোগ্য নহে। সেই পরিবর্ত্তনের যুগে, একজন তরুণী নারী, যেভাবে তাহার একক জীবন পরিচালনা করিয়া গিয়াছিল, আজকের যুগের তরুণীদিগের নিকট সেই স্বাবলম্বী স্বতন্ত্র জীবনের আদর্শ একান্তভাবে বরণীয় হওয়া উচিত। উনবিংশ শতাব্দীর সেই ঘনায়মান অন্ধকারে এই তরুণী বিধবা মারাঠা-নারীর শুভ্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, মনে হয়, সমস্ত রাজ-নৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। রাণী লক্ষ্মীবাঈএর বীরত্ব নয়, সেই বীরত্বের মূলে যে চারিত্রিক কঠোরতা, তাহাই হইল প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। ইংরাজ তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই চারিত্রিক কঠোরতাকে হার মানাইতে পারে নাই।

বিপ্লবের প্রথম মুখে ইংরাজরা প্রত্যেক শহর হইতেই বিতাড়িত হইয়া

যায়। প্রথম আক্রমণের আকস্মিকতায় এবং ব্যাপকতায় ইংরাজরা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। এবং সেই সময় যদি ভারতের রাজন্যবর্গ সকলের শক্তি একত্র সংহত করিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের মানচিত্র সেদিনই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। বিপ্লবীর দিকে যদিও ব্যক্তিগতভাবে সাহসী যোদ্ধা অনেকেই ছিল, কিন্তু সেই বহু-বিচ্ছিন্ন বিপ্লব-শিখাকে একমুখী করিয়া তুলিবার মত রাজনৈতিক এবং সামরিক শিক্ষা কাহারও ছিল না। যদিও তান্তিয়া টোপী এবং নানাসাহেব সেই চেষ্টাই করিয়াছিলেন কিন্তু ইংরাজের কূটবুদ্ধিতে তাহারা একত্র হইবার সুযোগ পায় নাই এবং আমাদেরই দেশের লোক সেই যোগসূত্রকে নিজেরাই ছিন্ন করিতে সাহায্য করিয়াছে।

পরাজয়ের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া ইংরাজ-সেনাপতিগণ তাহাদের অধিকতর সামরিক বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাতে অচিরকালের মধ্যেই নিজেদের সংহত করিয়া লইল এবং দুইদিক হইতে দুইজন অভিজ্ঞ সেনাপতি বিপ্লবীদের সায়েস্তা করিবার জন্য বিপুল সেনানী লইয়া অগ্রসর হইল। একদিক হইতে স্যার কলিন ক্যাম্প্‌বেল, আর একদিক হইতে স্যার হিউ রোজ অগ্রসর হইলেন। ক্যাম্প্‌বেল উত্তর ভারতের এক একটি বিপ্লবী কেন্দ্রকে সায়েস্তা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রোজ দক্ষিণা-পথ হইতে আক্রমণ শুরু করিলেন। উত্তর-অঞ্চলে শিখ, গুর্খা এবং অন্যান্য উপজাতি ক্যাম্প্‌বেলকে সহায়তা করিল, দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ এবং ভূপাল রোজের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ভারত-ইতিহাসের সনাতন ত্রুটি।

দক্ষিণ-অঞ্চলে, মাদ্রাজ, বম্বে এবং হায়দ্রাবাদে ইংরাজদের যে দেশী-বাহিনী ছিল, তাহারাও রোজের সহিত মিলিত হইল। এই বিরাট বাহিনী লইয়া রোজ ঝাঁসীর দিকে অগ্রসর হইলেন। মহ্‌উ, রায়গড়, সাতার দখল করিয়া রোজ মার্চ্চ মাসের ২৩ তারিখে ঝাঁসী হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে তাঁবু ফেলিলেন।

বিজয়ী ইংরাজ-বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদ যখন ঝাঁসীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, লক্ষ্মীবাঈ নিজের নারী-সত্তা ভুলিয়া গেলেন। পুরুষের মতন বেশ ধারণ করিয়া নিজেই সেনাপতিত্বের ভার গ্রহণ করিলেন এবং প্রাসাদের অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া রণ-প্রাঙ্গণে সৈন্যদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঝাঁসীর বীর সন্তানদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই তিনি তাহাদের হয় জয়ে, না হয় মৃত্যুতে লইয়া যাইবেন। ঝাঁসীর পতাকা, তিনি জীবিত থাকিতে, শত্রুর হাতে সমর্পণ করিবেন না।

স্যার রোজ তাঁবু হইতে ঝাঁসী আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইয়া, কয়েক মাইল আসার পরই বুঝিতে পারিলেন, নারী বলিয়া প্রতিপক্ষের নায়ককে মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া তিনি ভুল করিয়াছিলেন। যতই অগ্রসর হন, ততই দেখেন, চারিদিক হইতে অগ্নির লেলিহান শিখা তাঁহাদের বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে। অভিজ্ঞ সেনাপতির মতন লক্ষ্মীবাঈ আদেশ দিয়াছিলেন, ঝাঁসীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত অঞ্চলে আগুন ধরাইয়া দিতে, কোথাও যেন একটি শস্যকণা পড়িয়া থাকে না। স্যার রোজ সেই ভয়াবহ দাবানলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, কোথাও একটি বৃক্ষ পর্য্যন্ত নাই, পায়ের তলায় একটিও তৃণ নাই। খাঁখাঁ করিতেছে অগ্নি-দগ্ধ মরুভূমি। খাদ্যের অভাবে সৈন্য ও অশ্ব মারা পড়িতে লাগিল। সঙ্গে যাহা খাদ্য ছিল, তাহা ব্যবহার করিয়া শেষ করিয়া ফেলিলে আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না। এহেন সামরিক সঙ্কটে সিন্ধিয়া আর তেহ্‌রীর রাজা খাদ্য-সম্ভার লইয়া স্যার রোজকে বাঁচাইলেন, রাণী লক্ষ্মীবাঈএর সামরিক চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

এই ভাবে স্যার রোজ ঝাঁসীর দ্বারে উপনীত হইয়া ঝাঁসী আক্রমণ করিলেন। ঝাঁসীর দুর্গ হইতে ঘনগর্জ্জ কামান ইংরাজের কামানের প্রত্যুত্তর দিল। ঝাঁসীর রাণীর আদেশে ঝাঁসীর পুরনারীরা অন্তঃপুর ছাড়িয়া স্বামী-পুত্র-ভ্রাতার পার্শ্বে আসিয়া সাহায্য করিতে

লাগিল। সেদিনও ভারত-নারী সৈনিকের বেশে সৈনিকের কাজ করিয়াছে, জাতির জীবন-মরণ সংগ্রামে পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার অর্দ্ধেক ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অভিজ্ঞ সেনাপতির ন্যায় সেই তরুণ মারাঠা-নারী স্যার রোজের মত অভিজ্ঞ সেনাপতির বিরুদ্ধে সমর পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

আটদিন ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। ক্রমশঃ ইংরাজের বৃহত্তর সমর-আয়োজনের কাছে ঝাঁসীর ক্ষুদ্র শক্তির টিকিয়া থাকা দায় হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও রাণী লক্ষ্মীবাঈ দুর্গ ত্যাগ করেন নাই। ঝাঁসীর পতাকা হাতে লইয়া ক্লান্ত সৈনিকদের উৎসাহিত করিয়া তোলেন, মারো ফিরিঙ্গী!

কিন্তু নবম দিনের দিন নগরের প্রধানদ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। দুর্গের মধ্য হইতে যুদ্ধ করা আর সম্ভব নয় দেখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্য যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদের লইয়া বাঘিনীর মত রাণী লক্ষ্মীবাঈ দুর্গ ত্যাগ করিয়া ইংরাজ-সৈন্যদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ঘোরতর সম্মুখ-সমর শুরু হইয়া গেল। বীর মারাঠা-নারী সেই সম্মুখ-সমরে দু'হাতে শত্রুনিধন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন কিন্তু বুঝিতে পারিলেন তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্য বিপুল শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে আর বেশীক্ষণ যুঝিতে পারিবে না। বাহির হইতে বিপ্লবী সেনাদের তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আসার কথা ছিল। কিন্তু তখনও তাহা আসিয়া পৌঁছাইল না। যুদ্ধ করেন, আর দূর আকাশের দিকে উৎকর্ণ হইয়া থাকেন, বাহিরের সাহায্যের সঙ্কেতের আশায়। অবশেষে দূর হইতে সঙ্কেত আসিল বটে কিন্তু সে-সঙ্কেত তাঁহার জন্য নয়। তেহ্রীর বিশ্বাসঘাতক রাজা স্যার রোজের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছে।

লক্ষ্মীবাঈ ক্রমশঃ বুঝিলেন যে, এভাবে একক আর যুদ্ধ দেওয়া সম্ভব নয়। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে সর্দ্দাররা অনুরোধ করিল, এভাবে এখন

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা আপনার পক্ষে আর উচিত নয়। যে কোন মুহূর্তে ইংরাজ-সৈন্যরা আপনাকে বন্দী করিয়া ফেলিবে।

বীর-নারী বলিয়া উঠিলেন, মৃত্যুর জন্য ভয় করি না, কিন্তু ফিরিঙ্গীদের হাতে আমার এই দেহ যদি লাঞ্ছিত হয়, আমার সেই ভয়!

পরাজয় সুনিশ্চিত জানিয়া, লক্ষ্মীবাঈ স্থির করিলেন, তিনি কোন-মতেই ধরা দিবেন না, যদি জীবিত অবস্থায় নানাসাহেবের সঙ্গে যোগদান করিতে পারেন!

এই সঙ্কল্প করিয়া রাত্রিতে কয়েকজনমাত্র অনুচর লইয়া ছদ্মবেশে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া নগর-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগর-দ্বারে তখন বিশ্বাসঘাতক তেহ্‌রী-রাজের প্রহরীরা পাহারা দিতেছে। তাঁহাদের দেখিয়াই প্রহরীরা চীৎকার করিয়া উঠিল, কোউন্ হ্যায়?

অবিচলিতকণ্ঠে লক্ষ্মীবাঈ উত্তর দিলেন, স্যার রোজের বন্দে-বাহিনী!

প্রহরী দ্বার ছাড়িয়া দিল।

রাত্রির অন্ধকারে শত্রু-শিবির ভেদ করিয়া রাণী লক্ষ্মীবাঈ ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

স্যার রোজ ঝাঁসী দখল করিয়া দেখিলেন, আসল শত্রু পলাইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ লেফটেন্যাণ্ট বাউফারের অধীন একদল অশ্বারোহী পলাতক রাণীর পশ্চাদনুসরণ করিল। একাদিক্রমে একশো দু'মাইল অশ্বারোহণ করিয়া লক্ষ্মীবাঈ কল্‌পীতে পেশাওয়া শ্রীরাও সাহেবের আস্তানায় আসিয়া উঠিলেন। এবং কালবিলম্ব না করিয়া নূতন সৈন্যবাহিনী গঠন করিতে লাগিলেন। তাত্তিয়া টোপী আসিয়া কল্‌পীতে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। দুইজনে মিলিয়া পুনরাক্রমণের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। জীবন থাকিতে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইবেন না।

কল্‌পী হইতে নূতন বাহিনী লইয়া লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং কুঁচগাঁওএর প্রান্তরে পুনরায় স্যার রোজের সৈন্যদের

সহিত সংঘর্ষ শুরু হইয়া গেল। অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্তরা সুশিক্ষিত ইংরাজ-বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিল না।

পুনরায় পরাজিত হইয়া রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইংরাজরা বহু চেষ্টা করিয়া এবারেও তাঁহাকে ধরিতে পারিল না।

বারবার পরাজয়ে পেশাওয়া একেবারে নিরুদ্যম হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে তখন দুইটি দুরন্ত প্রাণী কোনমতেই পরাজয়ে হতাশ হইতে চাহিল না। একজন পুরুষ, তান্তিয়া টোপী, আর একজন নারী, রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ বান্দার নবাবের কাছে গিয়া সৈন্য চাহিলেন এবং বলিলেন, এই সব পরাজয়ে হতাশ হইলে চলিবে না। আমাদের সৈন্যবাহিনী যদি সুপরিচালিত এবং সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ করিব। এই ভাবে বান্দার নবাবকে উৎসাহিত করিয়া যমুনার তীরে রাণী লক্ষ্মীবাঈ আবার নূতন এক বাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। যমুনার জল স্পর্শ করিয়া তাহারা জীবনদানের শপথ গ্রহণ করিল।

কল্পীর প্রান্তরে রাণী লক্ষ্মীবাঈ ভীমবিক্রমে ইংরাজ-বাহিনীর ডান দিকে আক্রমণ করিল। সে-আক্রমণের ভীমবেগে ইংরাজ-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। গোলন্দাজ-বাহিনী কামান ফেলিয়া পলাইল। স্যার রোজ সেই আক্রমণের তেজে বিভ্রান্ত হইয়া গেলেন। সেই আক্রমণের মুখে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে বুঝিতে পারিয়া স্যার রোজ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সহিত একটা উষ্ট্র-বাহিনী ছিল। বিপদ বুঝিয়া সেই পার্ব্বত্য ঝরণার সম্মুখে তিনি সেই উষ্ট্র-বাহিনীকে আগাইয়া দিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈএর সমস্ত আক্রমণের বেগ সেই উষ্ট্র-বাহিনীতে নষ্ট হইয়া গেল। ইত্যবসরে সময় পাওয়া গেল, তাহার সুযোগে স্যার রোজ নূতন বাহিনী আনাইয়া পশ্চাদ্দিক হইতে কল্পী আক্রমণ করিলেন। নিঃশেষিত-তেজ বিপ্লবীবাহিনী

দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। স্যার রোজ কল্পীতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগর-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈকে ধরিতেই হইবে। কিন্তু কোথায় লক্ষ্মীবাঈ? বান্দার নবাব, পেশাওয়া বা লক্ষ্মীবাঈ, সেখানে কাহারও কোন চিহ্ন নাই।

সৈন্য নাই, রাজ্য নাই, অর্থ নাই, সহায় নাই, রাণী লক্ষ্মীবাঈ তথাপি আত্মসমর্পণের কথা ভাবিতেও পারিলেন না। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করিবেন।: যখন অন্যান্য পুরুষ বিপ্লবী-নেতারা বারবার পরাজয়ে হতাশ হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছেন, তখন এই বিপ্লবী মারাঠা-নারী একা নিজের অমিত তেজে তাঁহাদের পর্য্যন্ত উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছেন।

আবার একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা যুদ্ধের নূতন পন্থা নির্দ্ধারণ করিলেন। গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যখন তাঁহারা বিফলমনোরথ হইলেন, তখন রাণী লক্ষ্মীবাঈ এবং তান্তিয়া টোপী একদিন অতর্কিতে গোয়ালিয়ার আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিশ্বাসঘাতক জায়াজীরাও সিন্ধিয়া পলায়ন করিয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হইল। বিপ্লবী সেনারা গোয়ালিয়ার দখল করিয়া নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিল।

বিশ্বাসঘাতক জায়াজীরাওকে পুনরায় গোয়ালিয়ারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং রাণী লক্ষ্মীবাঈ যাহাতে আর শক্তিবৃদ্ধি না করিতে পারে তাহার জন্য, এক বিরাট বাহিনী লইয়া স্যার হিউ রোজ অবিলম্বে গোয়ালিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ যতটুকু অবকাশ পাইয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে নূতন করিয়া সেনাদল গঠন করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার দলে যাহারা সৈনিকরূপে যোগদান করিল, তাহারা অধিকাংশই সাধারণ নাগরিক, যুদ্ধ-বিদ্যা আয়ত্ত করিবার বিশেষ সুযোগ তাহারা পায় নাই। নিজের অসীম

সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সেই সেনাদল লইয়াই লক্ষ্মীবাঈ ইংরাজের সুশিক্ষিত বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যাহার অন্তরে অনির্ব্বাণ শিখার মত জ্বলিতেছে, তাহার বিচার করিবার সময় নাই, সে সমর্থ না অসমর্থ।

পুরুষ-সেনাপতির বেশে রাণী লক্ষ্মীবাঈ পুনরায় রণাঙ্গনে ভারতের ভাগ্য-পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া অবতীর্ণা হইলেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে, তাঁহার দুই প্রিয়সহচরী, মন্দার ও কাশী। তাঁহারাও পুরুষ-সৈনিকের বেশে মুক্ত তরবারিহস্তে ভারত-নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণা হইয়াছেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈএর বীরত্ব-কাহিনীর আড়ালে, এই দুই ভারত-নারীর অপূর্ব্ব জীবন-গরিমা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক যেদিন ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লিখিবেন, সেদিন এই দুই নারীর স্বেচ্ছাকৃত আত্মদান অগ্নি-অক্ষরে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

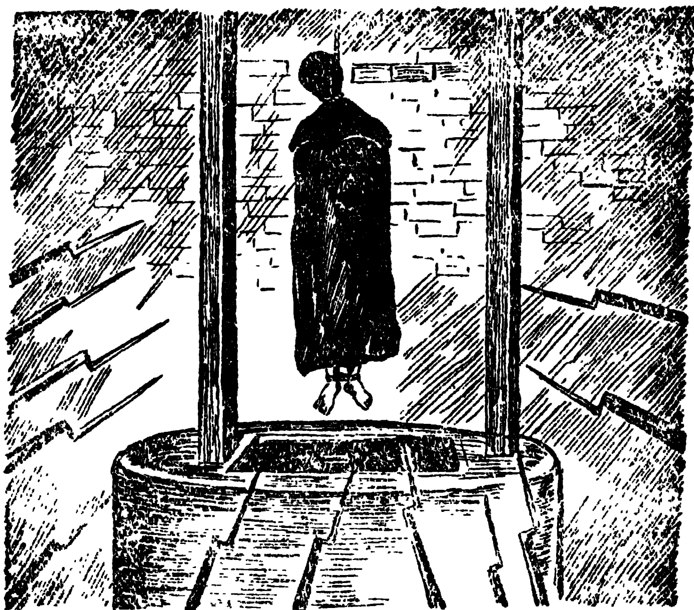
ইংরাজ গোলন্দাজ-বাহিনীর ভীম-আক্রমণে রাণী লক্ষ্মীবাঈএর সৈন্য ক্ষত-বিক্ষত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই মারাঠা-রমণী সমান তেজে শত্রুধ্বংস করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আজ মৃত্যু-পণ করিয়া তিনি সংগ্রামে নামিয়াছেন, হয় রণক্ষেত্রে প্রাণ দিবেন, না হয় জয়ী হইয়া ভারতের মর্য্যাদাকে রক্ষা করিবেন। প্রত্যাবর্ত্তন নাই। রাণী লক্ষ্মীবাঈএর বীরত্ব দেখিয়া প্রতিপক্ষ ইংরাজ-সেনানায়কেরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। চিরকাল তাঁহারা শুনিয়া আসিয়াছেন, অন্তঃপুরচারিণী ভারত-নারী দুর্ব্বলা, অসহায়া, ভীরু, আজ তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিলেন, সেই ভারত-নারী রণক্ষেত্রে অসি-হস্তে যে-বীরত্বের পরিচয় দিলেন, তাহাতে বহু অভিজ্ঞ পুরুষ-সেনাপতি পর্য্যন্ত লজ্জিত হইয়া গেলেন।

যুদ্ধের মৃত্যু-কলরবের মধ্যে সহসা রাণী লক্ষ্মীবাঈ শুনিলেন, তাঁহার

নাম ধরিয়া কে যেন ডাকিতেছে। পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, মন্দার ইংরাজ-সৈনিকের গুলিতে বিদ্ধ হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া গেলেন। মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে মন্দার বলিয়া উঠিলেন, বাঈসাহেব, আমি চল্লাম···আপনি অগ্রসর হ'ন! কিছুক্ষণ পরে কাশীও আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সহসা রাণী লক্ষ্মীবাঈ দেখিলেন, তিনি একা কয়েকজন ফিরিঙ্গী সৈনিক কর্ত্তৃক পরিবৃতা হইয়া গিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাদের আক্রমণ করিলেন। পার্শ্ব হইতে একজন ফিরিঙ্গী সৈনিক তাঁহার স্কন্ধের উপর আঘাত করিল। ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য হাতের তরবারি দিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু আর একজন ফিরিঙ্গী সৈনিকের আক্রমণে তাঁহার এক চক্ষু একেবারে আহত হইয়া গেল। রক্তে সর্ব্বাঙ্গ লাল হইয়া গিয়াছে। চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি তিনি বীরবিক্রমে একে একে সেই ফিরিঙ্গী সৈনিকগুলিকে স্বহস্তে বধ করিলেন। কিন্তু তখন আর তাঁহার দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি নাই। রক্তক্ষয়ে শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে। এই সময় তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর রামচন্দ্র রাও দেশমুখ তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মুমূর্ষু বীর-নারী বলিয়া উঠিলেন,দেশমুখ,আমার মৃতদেহ যেন শত্রু স্পর্শ না করিতে পারে।

এই শেষ আদেশের সঙ্গে সঙ্গে রাণী লক্ষ্মীবাঈএর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। সেই বীর-নারীর অন্তিম আদেশ তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর পালন করিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ সে তাঁহার মৃতদেহ রণক্ষেত্রে বাহিরে লইয়া গিয়া, নিকটস্থ অরণ্যে যথারীতি অগ্নিতে সমর্পণ করে।

নামহীন অরণ্যের নির্জ্জনতায় দু'একজন অনুচরের অশ্রুজলে উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারত-নারী তাঁহার গৌরবময় জীবনের শেষ গৌরব অর্জ্জন করিয়া এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন। প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধার স্বর্গে তিনি চির-অমলিন বিরাজ করিতেছেন।



তান্তিয়া টোপী

যেদিন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে লিখিত হইবে, সেদিন এই মারাঠা-ব্রাহ্মণের নাম উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। তাঁহার শত্রুপক্ষের সেনাপতিরাই লিখিয়া গিয়াছেন, যদি বিদ্রোহী সিপাহীদের দলে তান্তিয়া টোপীর মতন আর দুই একজন যোদ্ধা থাকিত, তাহা হইলে উনবিংশ শতাব্দীতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বতন্ত্র হইয়া যাইত।

ইংরাজ-ঐতিহাসিকগণ তান্তিয়া টোপীকে একজন সাধারণ ডাকাত হিসাবে দেখিতে আমাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি অন্ধকার বিস্মৃতির গর্ভ হইতে যে সব নজীর ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ খুঁজিয়া

বাহির করিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে এই অপূর্ব্ব ব্যক্তিটির চরিত্র এবং সামরিক শক্তি সম্পর্কে আর কোন সন্দেহই থাকে না। তান্তিয়া টোপী ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হইতে পারেন নাই বটে কিন্তু যেভাবে তিনি সেই সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক বিবরণ পড়িলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। গেরিলা-রণনীতিতে তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা তখন ইংরাজদিগের মধ্যেও ছিল না। কিন্তু যে-কারণে আজিকার ভারতবাসীর অন্তরে তান্তিয়া টোপী চরম শ্রদ্ধার আসনে বিরাজ করিতেছেন, তাহা হইল তাঁহার অনমনীয় চিরস্বাধীন মন। ভারতের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার তিনি মূর্ত্ত বিগ্রহ। একান্ত সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়, বারবার পরাজিত হইয়াও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইংরাজদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার কথা কল্পনাও করেন নাই। সারা মধ্যভারত জুড়িয়া ইংরাজ তাঁহাকে ধরিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, নিপুণভাবে তাঁহার চারিদিকে জাল বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক বারই এই ধূর্ত্ত মারাঠী তাহাদের সমস্ত সতর্ক আয়োজন তুচ্ছ করিয়া বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া ধরিয়াছে। অরণ্যে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে আত্ম-গোপন করিয়া, একান্ত একক অবস্থা হইতে মায়াবীর মতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অতর্কিতে শত্রু-সেনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, বারবার পরাজিত হইয়াছেন কিন্তু তবুও যুদ্ধের আশা ত্যাগ করেন নাই। বারবার ইংরাজরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে, কিন্তু ছদ্মবেশে কি কৌশলে যে তিনি বারবার তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেন তাহা তাহারা ভাবিয়া উঠিতে পারিত না। এই একটি লোককে যতদিন না ইংরাজরা ধরিতে পারিয়াছে ততদিন তাহাদের শান্তি ছিল না। এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের যাহা সনাতন কলঙ্ক, সেই বিশ্বাসঘাতকতার দরুণই একদিন অবশেষে এই চিরবিদ্রোহী ইংরাজদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন।

তাস্তিয়া টোপী হয়ত প্রথম জীবনে কোনও দিন কল্পনা করেন নাই যে অসি-হস্তে সারা ভারতবর্ষ তাঁহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে কারণ মসী-হস্তেই তাঁহাকে জীবন আরম্ভ করিতে হয়,—নিরীহ নকল-নবীশের জীবন। তিনি নানাসাহেবের দরবারে একজন সাধারণ নকল-নবীশ ছিলেন। তরবারির চেয়ে তাঁহার অধিক সম্পর্ক ছিল কলমের সঙ্গে। তবে তাঁহার চরিত্র-গুণে নানাসাহেব তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

কিন্তু নানাসাহেব যখন ইংরাজদের বিরুদ্ধে দেশীয় শাসকদের চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য পলাশীর পরাজয়ের শতবার্ষিকীর পূর্ব্বাহ্ণে গোপনে প্রচারকার্য্য করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই কার্য্যে তাস্তিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। সেই সূত্রে তাঁহার এই নিরীহ নকল-নবীশের রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং স্বদেশ-প্রেম দেখিয়া নানাসাহেব মুগ্ধ হন।

তারপর, সহসা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা লেলিহান হইয়া উঠিল। তাস্তিয়া টোপী কলম ছাড়িয়া অসি-হস্তে তাঁহার প্রভু নানাসাহেবের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং যতক্ষণ না মৃত্যু আসিয়া তাঁহাদের দুইজনকে পৃথক্ করিয়া দেয়, ততক্ষণ সে-পার্শ্ব তাস্তিয়া টোপী এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করেন নাই।

১৬ই জুলাই কানপুর শহরে নানাসাহেব পরাজিত হইয়া যখন বিঠুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য তিনি এক গোপন-সভা আহ্বান করিলেন। তখন বিজয়ী ইংরাজ-সেনাপতি হ্যাভ্‌লক কানপুর উদ্ধার করিয়া লক্ষ্ণৌএর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সেই সভায় পরাজিত বিদ্রোহী সেনাদলের সেনাপতিরূপে তাস্তিয়া টোপী সর্ব্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হন। সেইদিন হইতে নানাসাহেবের প্রতিনিধি এবং বিদ্রোহী সেনাদের প্রধান

সেনাপতিরূপে তান্তিয়া টোপী ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। সেইদিন হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত, তান্তিয়া টোপীর জীবন একটা অবিচ্ছেদ বিশ্রামবিহীন সংগ্রামের জীবন। একদিনের জন্যও তিনি বিশ্রাম করেন নাই, ইংরাজদেরও বিশ্রাম করিতে দেন নাই। একে একে বিপ্লবী দলের অধিকাংশ নায়কই ধরা পড়িলেন বা আত্মবিসর্জ্জন দিলেন, কিন্তু তান্তিয়া টোপীকে ইংরাজরা কোনমতেই ধরিতে পারিল না। এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যান, ইংরাজের চরেরা তাহার কোনও সন্ধান বাহির করিতে পারে না। আবার সহসা নূতন সৈন্যদল লইয়া অতর্কিতে শত্রু-শিবিরে হানা দেন। সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া চলিয়া যান; গভীর অরণ্যে হিংস্র শ্বাপদদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান, জনহীন তুঙ্গ পর্ব্বতের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকেন, আবার কখন কোনও দেশীয় শাসকের দরবারে আসিয়া বিদেশীর বিরুদ্ধে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। এই ভাবে ভারতের অবিনাশী বিজয়-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ সারা মধ্যভারত তিনি বিচরণ করিয়া বেড়ান।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ যেদিন গোয়ালিয়রের প্রাঙ্গণে অসি-হস্তে দেহত্যাগ করিলেন, সেদিন বিপ্লবীদের সকল আশা শূন্যে মিলাইয়া গেল। কিন্তু তখনও তান্তিয়া টোপী আশা ত্যাগ করিলেন না। পুনরায় নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি সেনাপতি উইন্‌ড্‌হাম্‌কে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সুশিক্ষিত ইংরাজ-বাহিনীর সামনে বেশীক্ষণ যুঝিতে পারিলেন না। রাত্রির অন্ধকারে সাঁতার্‌ দিয়া নর্ম্মদা পার হইয়া আবার অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখান হইতে ভারতপুর, এবং ভারতপুর হইতে জয়পুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়পুরের মহারাজাকে এই সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-সেনানায়ক কর্ণেল হোম্‌স্‌ সেই সংবাদ পাইয়া কালবিলম্ব না করিয়া জয়পুরের দিকে অগ্রসর

হইলেন। ভয়ে জয়পুরের রাজা সরিয়া দাঁড়াইলেন। বাধ্য হইয়াই সেখান হইতে তান্তিয়া টোপী আবার সরিয়া পড়িলেন।

পথে ইন্দ্রগড়ে আসিয়া তিনি পুনরায় একটা বাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। সেই বাহিনী লইয়া বর্ষা-সংক্ষুব্ধ রাত্রিতে দুরন্ত নদী পার হইয়া সহসা এক ইংরাজ-বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদ কাড়িয়া লইলেন। তখন চারিদিক হইতে সমস্ত ইংরাজ-সেনানায়ক এই চির-পলাতক দুর্দ্দান্ত বিপ্লবীকে ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রবার্ট্‌স্‌, হোম্‌স্‌, পার্ক, মিচেল, হোপ এবং লক্‌হার্ট, প্রত্যেকেই য়ুরোপের বহু যুদ্ধে নিজেদের রণ-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। এতগুলি সেনানায়ক একসঙ্গে মিলিতভাবে তান্তিয়া টোপীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মিচেল দক্ষিণ দিক হইতে, লিডেল এবং মীড পূর্ব্ব ও উত্তর দিক হইতে, পার্ক পশ্চিম দিক হইতে এবং রবার্ট্‌স্‌ চম্বাল নদীর দিক হইতে, তান্তিয়াকে ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এবার কি করিয়া এই মারাঠী পার্ব্বত্য-মূষিক পালায়, তাহা দেখিতে হইবে। তান্তিয়া টোপী দেখিলেন, তাঁহার ভরসা একমাত্র সম্মুখের গভীর অরণ্য। ইংরাজ-সেনাপতিরা কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে সেই গভীর বর্ষার মধ্যে সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর দিয়া কোন সৈন্য অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু তান্তিয়া সেই দুর্ভেদ্য অরণ্য রাত্রির মধ্যে অতিক্রম করিয়া অতর্কিতে এক ইংরাজ-বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া পর্ব্বতের মধ্যে বিদ্যুদ্‌বেগে আত্মগোপন করিলেন। আবার পরের দিন সেই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া অতর্কিতে আর এক দলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। কোথা হইতে, কেমন করিয়া বাহির হইতেছেন, আবার অদৃশ্য হইয়া যাইতেছেন। ইংরাজ-সেনানায়কেরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। সেই দুঃসাহসিক বীরত্বের কথা উল্লেখ করিয়া ইংরাজ-ঐতিহাসিক ম্যালেসন বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এই সাহসিকতা

এবং রণ-কৌশলের সম্মুখে শ্রদ্ধায় মাথা নত না করিয়া থাকা যায় না।

এই ভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, তান্তিয়া টোপী স্বল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া ইংরাজদের বিভ্রান্ত করিয়া এক দেশীয় রাজার দ্বার হইতে অন্য দেশীয় রাজার দ্বারে সাহায্যের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তখন বিজয়ী ইংরাজ-বাহিনীর বিরুদ্ধে কেহই আর মাথা তুলিতে সাহস করে না।

অবশেষে সিখারের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তান্তিয়া টোপী মাত্র দু'টি ঘোড়া, দু'জন ব্রাহ্মণ অনুচর এবং একজন ভৃত্য লইয়া গোয়ালিয়ারের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, সেখানকার এক জঙ্গলে সর্দার মানসিংহ আত্মগোপন করিয়া আছেন, তিনি মানসিংহের শরণাপন্ন হইয়া সেই অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

চরমুখে সেই সংবাদ পাইয়া ইংরাজরা গোপনে মানসিংহের নিকট দূত পাঠাইল, যদি তান্তিয়া টোপীকে ধরাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মানসিংহ নিজের জীবনভিক্ষা তো পাইবেই, তাহা ব্যতীত বিরাট জায়গীর উপহারস্বরূপ পাইবে। বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ তাহাতে সম্মত হইল।

গভীর অরণ্যে রাত্রিবেলা তান্তিয়া টোপী ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময় কিসের শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখেন, তাঁহার চারিদিকে মশাল হাতে সশস্ত্র ইংরাজ-সৈন্য। তান্তিয়া টোপী বুঝিলেন, এতদিন পরে তাঁহার সংগ্রাম শেষ হইল। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ইংরাজ-সৈনিকেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল।

বিচারের প্রহসন-স্বরূপ যথারীতি কোর্ট মার্শাল বসিল। এবং বিচারে তাঁহার ফাঁসীর হুকুম হইল। তান্তিয়া টোপী বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

ফাঁসীর দিন কর্ম্মকার আসিয়া যখন তাঁহার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দিল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে তাঁতিয়া টোপী নির্ভীক পদক্ষেপে ফাঁসী-মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ সৈনিক অনাগত লোকদের কাছে তাহার অসমাপ্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া বীরগর্ব্বে মৃত্যুর হাত হইতে জয়মাল্য গ্রহণ করিল।



ওয়াহাবী আন্দোলন

সৈয়দ আহ্‌মদ, তিতু মিঞা

ভারতবর্ষ যখন সিপাহী-বিপ্লবের মধ্য দিয়া এই দেশ হইতে ইংরাজ-শাসন দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজ-বিতাড়নের একটা প্রবল আয়োজন চলিতেছিল। সিপাহী-বিপ্লব ব্যর্থ হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দলের লোকেরা পেশাওয়ার হইতে বাংলা পর্যান্ত একটা বিরাট ষড়যন্ত্র গঠন করিয়া তোলে এবং এমন নিঃশব্দে তাহারা এই বিরাট আয়োজন গড়িয়া তুলিয়াছিল যে ইংরাজ প্রথমে তাহার কোন অনুসন্ধানই পায় নাই। এই আয়োজনের নাম ওয়াহাবী আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ভারতীয়

মুসলমানদিগের দ্বারাই পরিচালিত হয়। ভারতবর্ষ হইতে বিধর্ম্মী ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানের ইহাই শেষ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামে পরাজিত হইবার পর, ইংরাজ-রাজনৈতিকগণের চতুর প্রচার-কার্য্যের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। সিপাহী-বিপ্লব ভারতীয় মুসলমানকে ভারতীয় হিন্দুর পাশে দাঁড়াইয়া এক সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাহিরের শত্রুকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার শিক্ষা দান করে, ওয়াহাবী আন্দোলন স্বতন্ত্রভাবে ভারতীয় মুসলমানকে, ইংরাজ তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শত্রু, এই শিক্ষা দান করে।

সেইজন্য ইংরাজ-রাজনৈতিকগণ কৌশলে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি করেন এবং ইংরাজ যে ভারতীয় মুসলমানের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, এই কথাই তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কংগ্রেস আসিয়া পুনরায় ইংরাজ-প্রচারিত এই ভ্রান্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের সজাগ করিতে চেষ্টা করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে উত্তর-ভারতে রায়-বেরেলী প্রদেশে সৈয়দ আহ্‌মদ নামে এক মহাশক্তিশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় উত্তর-ভারতে একজাতীয় লোক, ইংরাজদের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। ইতিহাসে তাহাদের নাম পিণ্ডারী। তাহারা সকলেই অশ্বারোহী সৈন্য ছিল এবং দলবদ্ধভাবে তাহারা এক এক শহর বা গ্রামের উপর অতর্কিত আক্রমণ করিত। তাহাদের যেমন ছিল শক্তি, তেমনি ছিল সাহস। দস্যু হিসাবে, ইংরাজ-রাজশক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে বহু অভিযান পরিচালনা করে। এবং সর্ব্বশেষে তাহাদের উচ্ছেদ করিয়া ফেলে।

আহ্মদ জীবনের প্রথম মুখে এই জাতীয় এক পিণ্ডারীদের দলে অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন। তাঁহার দলপতির নাম ছিল আমীর খান পিণ্ডারী। তাহাদের ভয়ে মালবের চারিদিকে লোকে সর্ব্বদাই আতঙ্কিত হইয়া থাকিত। কিন্তু কিছুকাল পরেই আহ্মদ পিণ্ডারীদের দল ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। দিল্লীতে আসিয়া এক খ্যাতনামা মৌলানার শিষ্যরূপে তিনি ইসলামীয় আইন-তত্ত্ব নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন করেন। তাহার ফলে তাঁহার চিন্তাশক্তি সম্পূর্ণ এক নূতন পথে পরিচালিত হয়। তাঁহার মনে এক বিরাট কল্পনা জাগিয়া উঠে, ভারতবর্ষে পুনরায় ইসলাম-তত্ত্বসম্মত এক সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলা। তাহার জন্য প্রথম প্রয়োজন, ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করা। এই আদর্শ তাঁহাকে এমনভাবে পাইয়া বসে যে, তিনি এই কার্য্যের জন্য যেন ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধ-মূল হইয়া যায় এবং ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য ধর্ম্মের আবরণে এক বিরাট ষড়যন্ত্র গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করেন। কোনও সহায়সম্বল না থাকা সত্ত্বেও, যেভাবে তিনি এই বিরাট ষড়যন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার পরিধির কথা ভাবিলে তাঁহার গঠনশক্তিতে সত্যই স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। ধর্ম্ম-প্রচারকের বেশে তিনি পায়ে হাঁটিয়া সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন এবং যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই এক একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন এবং দলে দলে লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছে। ধর্ম্মের আবরণে তিনি ইংরাজ-ধ্বংসের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। এই ভাবে সারা দেশের মধ্যে তিনি বহু কেন্দ্র স্থাপন করেন। পাটনা শহরে একটি মূল কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং ভারতবর্ষের বাহিরে, ইংরাজ-চক্ষুর আড়ালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বাহিরে তাঁহার ষড়যন্ত্রের মূল দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতবর্ষের কেন্দ্র হইতে লোক এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া সীমান্তের এই

ঘাঁটিতে পাঠান হইত। যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে এইসব লোক এবং অর্থ সীমান্তের ঘাঁটিতে গিয়া পৌছায়, তাহার জন্য দু'হাজার মাইল পথ ব্যাপিয়া একটা প্রতিষ্ঠান-চক্র স্থাপিত হয়। তিনি সমস্ত দলকে সামরিক ভিত্তিতে গড়িয়া তোলেন এবং লোকচক্ষুর আড়ালে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আয়োজন করেন। তাঁহার নিজস্ব কর-সংগ্রাহক, বিচারক, পাইক, পেয়াদা এবং ডাক-বাহক ছিল। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রচারকগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লোক এবং অর্থ সংগ্রহ করিত এবং শিষ্যদের মধ্যে যাহারা জীবন-উৎসর্গ করিতে স্বীকৃত হইত, তাহাদের এই সংগ্রামের সৈনিকরূপে সীমান্তের তাঁবুতে পাঠান হইত।

সৈয়দ আহ্‌মদ যখন মক্কা-তীর্থে গমন করেন, সেখানে তিনি এক নূতন আদর্শের সন্ধান পান। সমগ্র আরব তখন এক নূতন ব্যক্তিত্বের আদর্শে নিজেদের মুমূর্ষু সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে গড়িয়া তুলিতেছে। সে ব্যক্তির নাম আবদুল ওয়াহেব। প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যেসব অন্যায় আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা নির্ম্মহস্তে বিদূরিত করিয়া আবদুল ওয়াহেব আরবের ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিকে এক নূতন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন। সৈয়দ আহ্‌মদ তাঁহার আদর্শকেই জীবনে বরণ করিয়া লইলেন। আবদুল ওয়াহেবের শিষ্যরাই নিজেদের ওয়াহাবী বলিয়া পরিচয় দিতেন। সৈয়দ আহ্‌মদ মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতের মুসলমানদের মধ্যে সেই আদর্শকেই প্রচার করিতে লাগিলেন। তাই তাঁহার অনুষ্ঠিত বিপ্লব-আয়োজনকে ওয়াহাবী আন্দোলন বলা হয়।

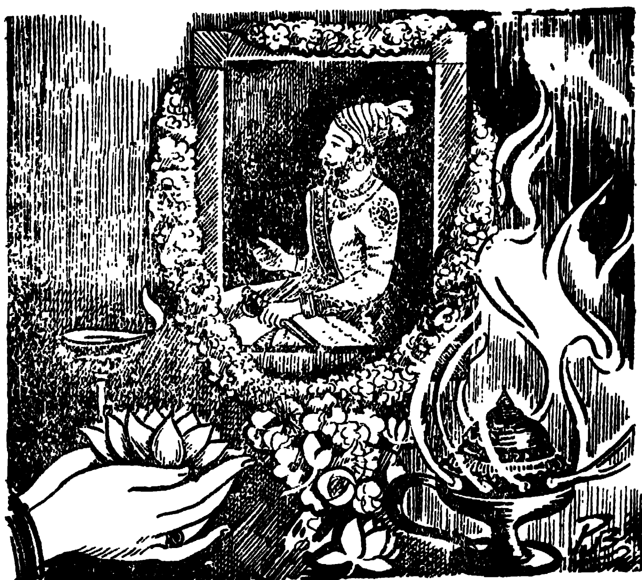
দুঃখের বিষয় এই বিরাট আয়োজনের অনেকখানি শক্তি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শিখদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং যখন আয়োজন প্রায় সঙ্ঘবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়, ইংরাজ সজাগ এবং সতর্ক হইয়া উঠে। বহু খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ হয় কিন্তু

অধিকাংশ স্থলে সংঘর্ষের পূর্ব্বেই এক একটি কেন্দ্র ইংরাজ ধ্বংস করিয়া দেয় এবং দলের অধিকাংশ বড় বড় নেতাই কারারুদ্ধ হইয়া যান। এই ভাবে সিপাহী-বিপ্লবের ন্যায় ওয়াহাবী আন্দোলনও ব্যর্থ হইয়া যায়।

এই আন্দোলনের' মধ্যে সৈয়দ আহ্মদ ব্যতীত যাঁহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অনেকেই বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন ; সংগ্রামের মধ্যপথেই সৈয়দ আহ্মদ পরলোক-গমন করেন কিন্তু তাঁহার অনুগামী শিষ্যদের বিশ্বাস হয় যে তিনি যদিও বা মরিয়া থাকেন, অচিরকালের মধ্যেই অলৌকিক দেহ লইয়া তিনি আবার আবির্ভূত হইবেন এবং ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে অধিনায়কত্ব করিবেন। এই কথা প্রচার করিয়া তাঁহার দলের প্রধান ব্যক্তিরা বহুদিন পর্য্যন্ত এই আন্দোলনকে জীয়াইয়া রাখেন।

ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে অনেকেই জীবনের অতি সাধারণ স্তরের লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে-গঠনশক্তি এবং রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেন, তাহাতে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। তাঁহাদের জীবন দেখিয়া, এই কথা বিশ্বাস করিতে হয় যে, যাহাদের সাধারণ মানুষ বলিয়া আমরা অবজ্ঞা করি, উপযুক্ত সুযোগ এবং সংযোগ ঘটিলে তাহাদের মধ্য হইতেই অসাধারণত্ব বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা আছে, তাহার বিকাশ-সাধন করাই বর্ত্তমান রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য।

মহম্মদ শফী ছিলেন এই আন্দোলনের কোষাধ্যক্ষ এবং অন্যতম প্রধান নেতা। এই আন্দোলনে যোগদান করার আগে, তাঁহার কাজ ছিল, বৃটীশ সৈন্যদের মাংস সরবরাহ করা। এই সূত্রে ইংরাজ-তাঁবুতে তাঁহার অবাধ যাতায়াত ছিল এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাহাড়ে পশুপালক যেসব উপজাতি ছিল, তাহাদের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই সংযোগের সুবিধায় মহম্মদ শফী ইংরাজদের চোখে ধূলা দিয়া



এ যুগের প্রথম শহীদ

উনবিংশ শতাব্দী যখন শেষ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময় ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতবাসী পরাধীনতায় এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, একদিন তাহারা স্বাধীন ছিল, সে কথা কল্পনা করিতেও যেন তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইংরাজ কৌশলে এবং আইনের সাহায্যে ভারতবাসীর হস্ত হইতে সকল প্রকার অস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছে। কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত এই বিরাট দেশ ইংরাজ-শাসনের আপাতশান্তির মধ্যে রাজনীতি এবং দেশ-সেবার সর্ব্বপ্রকার আদর্শ হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া নিজের অলস জড়ত্বের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়া-

ছিল। ইংরাজ-শাসনই ভারতের চরম ভবিতব্যতা, বিধাতার অভিপ্রেত, এই জাতীয় একটা ধারণা, সর্ব্বসাধারণের মনে স্থানলাভ করে।

দেশব্যাপী এই জড়ত্বের মধ্যে তখন মাত্র দুইটি প্রদেশ অন্য আর এক দিক দিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। বাংলা এবং মহারাষ্ট্র। এই দুই প্রদেশে সেই সময় বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষার দিক হইতে তাঁহারা সকলের অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার ষোল-আনা সুবিধা তাঁহারা গ্রহণ করেন এবং অসাধারণ মেধার সাহায্যে তাঁহারা ভারতবর্ষের বাহিরে বিশ্ব-জগতের দিকে চাহিয়া দেখিতে শিখিলেন। বাংলাদেশে এবং মহারাষ্ট্রে সেইসব অনন্যসাধারণ মস্তিষ্ক-জীবী কৃতী-পুরুষ, ভারতব্যাপী সেই জড়ত্বের মধ্যে আত্মচেতনার যে-আলোক-শিখা জ্বালাইয়া তুলিলেন, তাহারই প্রাণদায়ী উত্তাপে ভারতবর্ষে নব-জীবনের অঙ্কুর মাথা তুলিয়া উঠিল।

সেই নূতন চেতনার আলোকে মহারাষ্ট্র-যুবকেরা তাঁহাদের দেশের ইতিহাসের পিছন দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এক বিরাট পুরুষ মৃত অতীতের শ্মশানভূমি হইতে যেন তাঁহাদের আহ্বান করিতেছেন। সেই বিরাট পুরুষ হইলেন, শিবাজী। শিবাজীর জীবন তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে এক নূতন আদর্শকে তুলিয়া ধরিল।

একজন সামান্য জায়গীরদারের ছেলে, সম্পূর্ণ সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়, সুপ্রতিষ্ঠিত এক বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেভাবে একটা সম্পূর্ণ নূতন সাম্রাজ্য গঠন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে, তাঁহারা নিজেদের অন্তরের সংগোপন আশার সমর্থন পাইলেন। আত্মশক্তির প্রতীকরূপে তাই তাঁহারা রাজা শিবাজীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। স্থির করিলেন, সারা দেশের মধ্যে শিবাজী-উৎসবের প্রবর্ত্তন করিবেন। তখন প্রকাশ্যভাবে, জাতীয়তা-আন্দোলন করা আইনতঃ অসম্ভব ছিল। তাই, এই শিবাজী-উৎসবের আবরণে তাঁহারা জাতীয়তার আদর্শ

প্রচারের আয়োজন করিলেন। মহারাষ্ট্র হইতে সেই উৎসব বাংলায় আসিল। সে-যুগের তরুণ বাঙালীরাও ঘটা করিয়া শিবাজী-উৎসবের প্রবর্ত্তন করিলেন। বাংলার কবি অমর ভাষায় সেই উৎসবকে বাণীরূপ দিলেন, তাঁহার শিবাজী কবিতায়। এই ভাবে মহারাষ্ট্রের সেই বীরপুরুষ ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের অন্তরে পুনরায় আত্মশক্তির নির্ব্বাপিত শিখাকে জ্বালাইয়া তুলিলেন। একদল শিক্ষিত তরুণের মনে দেশের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা সুতীব্র হইয়া উঠিল। বাহিরে আত্মপ্রকাশের কোন সুযোগ না থাকার দরুণ স্বভাবতঃই তাহারা গোপনে দল বাঁধিতে আরম্ভ করিল। শুরু হইল বিপ্লববাদের যুগ। মারাঠা এবং বাংলাদেশেই তাহা প্রথম উর্ব্বর জমি পাইল।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ভয়াবহ প্লেগের আবির্ভাব হয়। গ্রামের পর গ্রাম দেখিতে দেখিতে শ্মশানে পরিণত হইয়া যাইতে লাগিল। এই প্লেগ নিবারণের জন্য ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিরোধ-ব্যবস্থার নামে প্লেগ-নিবারক ইংরাজ-কর্ম্মচারীরা আতঙ্কগ্রস্ত মূর্খ গ্রাম-বাসীদের উপর ভীষণ উৎপাত শুরু করিয়া দিল। এক মিনিটের নোটীশে ঘর-বাড়ী, জিনিষ-পত্র সমস্ত ত্যাগ করিতে হইত। একে প্লেগের আতঙ্ক, তাহার উপর সরকারী কর্ম্মচারীদের উৎপাত, সাধারণ লোকেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সেই সময় বালগঙ্গাধর তিলক মারাঠা ভাষায় "কেশরী" নামে একখানি সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন। কেশরীতে তিলক প্লেগ-কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ডের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ফলে তিনি রাজরোষে পড়িলেন, মিঃ র‍্যাণ্ডের ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

সেই সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক-উৎসব ভারতবর্ষে খুব ঘটা করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন পুণার লাট-

প্রাসাদে সেই উৎসবে যোগদান করিয়া, রাত্রিকালে উৎসব-শেষে মিঃ র‍্যাণ্ড এবং মিঃ আয়ার্ষ্ট বাড়ী ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ অন্ধকারে পথের মধ্যে তাঁহারা আক্রান্ত হইলেন এবং সেইখানেই নিহত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ভারতবর্ষের বিপ্লব-আন্দোলনের ইহাই প্রথম রক্তপাত।

চারিদিকে ধর-পাকড় শুরু হইয়া গেল। মিঃ র‍্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কেশরীতে সম্পাদকীয় লিখার দরুণ তিলক কারারুদ্ধ হইলেন। দামোদর চাপেকর নামে একজন মারাঠা-যুবক এই সম্পর্কে গ্রেফতার হইলেন এবং মিঃ র‍্যাণ্ডের হত্যাকারীরূপে বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত নব-যুগের ইহাই হইল প্রথম আহুতি।

এই ঘটনা হইতে ক্রমশঃ বিপ্লববাদ জনতার মধ্যে বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। যে গোয়েন্দা চাপেকরকে ধরাইয়া দিয়াছিল, চাপেকরের বিচারের পর, একদিন দেখা গেল, তাহার মৃতদেহ রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছে। বিপ্লববাদের ইতিহাসে দেখা যায়, বিপ্লববাদকে দমন করিবার জন্য সরকারী শাস্তি যত কঠোর হয়, বিপ্লববাদ ততই প্রসার-লাভ করে। জাতির মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা যখন সত্যই জাগ্রত হয়, তখন কোন কঠোরতায় তাহাকে বিনষ্ট করা যায় না। আঘাতে তাহার শক্তি বৃদ্ধি করে।



একখানি বইএর কাহিনী

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে একখানি বইএর অপূর্ব্ব কাহিনী লুকায়িত হইয়া আছে। এই কাহিনী হইতে বুঝা যায়, শাসক সম্প্রদায় সত্যকে কতখানি ভয় করে। সত্যকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য সভ্যতার আদিম যুগ হইতে শক্তিশালী দাম্ভিক সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছে কিন্তু সমস্ত নির্য্যাতন, সমস্ত নিষ্পেষণ, সমস্ত লাঞ্ছনাকে অস্বীকার করিয়া সত্য দিব্যমূর্ত্তিতে একদিন না একদিন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তবুও আজ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক মানুষ সত্যকে সহজভাবে স্বীকার করিয়া লইতে শিখিল না। তাহারই নিষ্পেষণের জন্য প্রেস অ্যাক্ট্, অর্ডিন্যান্স, সিডিশন অ্যাক্ট্,—রাজশক্তির শত হস্তে শত মারণ-যন্ত্র।

যে-সময় পুণায় চাপেকরের বিচার হইতেছিল, সেই সময় আর একজন মহারাষ্ট্র-যুবকের বুকে স্বদেশের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার নাম বিনায়ক দামোদর সাভারকর।

সাভারকর বিলাতে উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করেন। তখন সেখানে একজন প্রবাসী ভারতবাসী ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ইণ্ডিয়া হাউস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের গৃহে ভারতীয় ছাত্ররা বাস করিতে পাইত। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম হইল শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মা।

কৃষ্ণবর্ম্মা কিন্তু গোপনে এই প্রতিষ্ঠানের মারফত ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের বিপ্লবে দীক্ষা দিবার আয়োজন করেন। সাভারকর সেই গোপন দলে যোগদান করেন এবং ভারতে বিপ্লবের বহ্নি জ্বালাইয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ করেন। ইণ্ডিয়া হাউসে গোপনে তাঁহারা অস্ত্রশিক্ষা করিতেন।

কিন্তু সাভারকর বিপ্লব-প্রচারের একটি নূতন পন্থা আবিষ্কার করিলেন। বহু গবেষণা করিয়া সিপাহী-বিপ্লবের একটি ইতিহাস তিনি রচনা করিলেন। ইহা মূলতঃ মারাঠা ভাষাতেই লিখিয়াছিলেন। এই বিরাট গ্রন্থে সাভারকর প্রকাশ্যভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের আহ্বান ঘোষণা করেন। তাহার প্রতি ছত্রে প্রবল দেশ-প্রেমের সঙ্গে তীব্র ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রচারিত হয়। প্রকাশ-মাত্রই গভর্ণমেণ্ট এই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করেন। এবং সাভারকর মারাত্মক বিপ্লবীরূপে ইংরাজের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। তিনি স্থির করিলেন, এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া সারা ভারতবর্ষে প্রচার করিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষে কোন মুদ্রাকরই তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। তখন সাভারকর ইংলণ্ডে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃটিশ গোয়েন্দারা খবর পাইয়া গিয়াছিল। সেই ভয়ঙ্কর পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধানে তাহারা

সারা ইংলণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রত্যেক প্রেসের নিকট এই পুস্তক মুদ্রণ সম্পর্কে সতর্ক-বাণী প্রেরিত হইল। সাভারকর বহু চেষ্টা করিয়াও ইংলণ্ডের কোন প্রেসের সহায়তা পাইলেন না। তিনিও প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া হউক এই পুস্তক তিনি প্রকাশিত করিবেনই। ইংলণ্ড হইতে গোপনে পাণ্ডুলিপি লইয়া প্যারিসে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ গোয়েন্দারা ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে এই সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিল। ফরাসী গভর্ণমেণ্টও গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া সমস্ত প্রেসকে সাবধান করিয়া দিল। সমগ্র ফ্রান্সেও সাভারকর একটিও মুদ্রাকর পাইলেন না।

তখন সাভারকর একটা কৌশল অবলম্বন করিলেন। কৌশলে গোয়েন্দা-মহলে একটা খবর প্রচারিত করিয়া দিলেন যে দক্ষিণ-ফ্রান্সের কোন এক প্রেসে পুস্তকখানি ছাপা হইতেছে। ফরাসী গোয়েন্দারা সেই অঞ্চলেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সাভারকর তখন হলাণ্ডের এক প্রেসে পুস্তকখানি ছাপাইয়া লইলেন। এবং নানা কৌশলে সেই বই ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। স্কট এবং ডিকেন্সের অতি-পরিচিত নভেলের জ্যাকেট খুলিয়া লইয়া এই পুস্তকের অঙ্গে জড়াইয়া দেওয়া হইত।

এই বইখানি ভারতীয় তরুণদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বহু বিপ্লবী দল গোপনে এই পুস্তক ছাপাইয়া বিক্রয় করিত। বিখ্যাত বিপ্লবী ভগৎসিং এই ভাবে এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন। এক একখানি বই একশত টাকায়ও বিক্রীত হইয়াছে।

সাভারকর যখন বুঝিলেন বৃটিশ গোয়েন্দাদের হাতে হয়ত তাঁহাকে ধরা পড়িয়া যাইতে হইবে, তখন এই ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি তিনি প্যারিস শহরে বিখ্যাত বিপ্লবী পার্শী রমণী ম্যাদাম কামার জিম্মায় রাখিয়া যান। ম্যাদাম কামা তাঁহার ধন-সম্পত্তির মধ্যে অতি মূল্যবান ঐশ্বর্য্যের

মত এই পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষণ করিতেন। ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সে তাঁহার গোপন সিন্দুকে এই পাণ্ডুলিপি তিনি রাখিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণরা যখন প্যারিস শহর আক্রমণ করে, তখন ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের বাড়ীর পতনের সময় এই পাণ্ডুলিপিখানিও বিনষ্ট হইয়া যায়।

বৃটিশ গোয়েন্দারা সাভারকরকে ধরিবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। ফ্রান্সের এক বন্দরে তিনি ধরা পড়েন। কিন্তু বন্দী অবস্থায় যখন তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া আসা হইতেছিল, সেই সময় মধ্য-সমুদ্র হইতে তিনি গোয়েন্দাদের চোখে ধূলা দিয়া অদৃশ্য হইয়া যান। পরে তিনি পুনরায় ধৃত হন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ আনা হয় যে, তাহার সম্মিলিত শাস্তির পরিমাণ হয়, পঞ্চাশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড।

সুদূর আন্দামানে তিনি দীর্ঘ বন্দীজীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু এত নির্য্যাতন সত্ত্বেও, তাঁহার অন্তরের সেই স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাই বীর সাভারকর নামে আজও ভারতবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়া থাকে।



অরবিন্দ ঘোষ

তখনও কলিকাতা শহর রাত্রির ঘুমে অচেতন। পূর্ব্ব-কোণে সূর্য্যোদয়ের ঈষৎ আভাস দেখা যাইতেছে। বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে, একদিন এমনি উষা-কালে গ্রে ষ্ট্রীটের এক বাড়ীর দরজায় একজন ইংরাজ-পুলিশ-অফিসর সশস্ত্র অনুচরদের লইয়া হানা দিল।

এই বাড়ীতে নাকি একজন ভয়ঙ্কর ডাকাত আছে। সেই ডাকাতকে ধরিবার জন্য তাহারা কাক-পক্ষী না ডাকিতেই উপস্থিত হইয়াছে।

বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল। হাতে

রিভলভার তুলিয়া লইয়া ইংরাজ-অফিসর দ্বিতলের এক কক্ষে গিয়া দেখিল, ঘরের মেঝেতে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর একজন লোক ঘুমাইয়া আছে। ঘরের চারিদিকে অফিসরটি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, আসবাব-পত্র বলিতে কিছুই নাই। শুধু কতকগুলি বই মেঝেতে ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। একটা কুঁজো, দেয়ালে একটা চাদর এবং জামা। ঘরটি দেখিয়া বুঝিতে দেরি হয় না, এই ঘর যাহার সে নিতান্তই দরিদ্র।

পুলিশের দাপাদাপির শব্দে মেঝেতে যে ভদ্রলোকটি নিদ্রা যাইতেছিলেন, তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখেন, রিভলভার হাতে পুলিশ দাঁড়াইয়া।

ইংরাজ-অফিসরটি নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, যে-ভয়ঙ্কর লোকটিকে গ্রেফতার করিবার জন্য তাহারা আসিয়াছে, ইনিই হইলেন সেই ব্যক্তি, অরবিন্দ ঘোষ।

বিছানার দিকে চাহিয়া ইংরাজ-অফিসরটি ব্যঙ্গের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, শুনিয়াছি তুমি নাকি লেখাপড়া ভাল জান, তবে এই রকম দরিদ্রভাবে থাকিতে তোমার লজ্জা করে না?

অরবিন্দ গম্ভীরভাবে বলিলেন, আমার দেশবাসী সবাই গরীব। আমিও গরীব। তাই গরীবের মতই থাকি!

সাহেব বলিয়া উঠিল, তাই বুঝি ডাকাতি করিয়া রাতারাতি বড়লোক হইতে চাও?

সে-কথার কোনও জবাব না দিয়া অরবিন্দ কারাগারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ইংরাজ-অফিসরটির নির্দ্দেশে পুলিসের লোক আসিয়া তাঁহার হাতে লৌহ-শৃঙ্খল পরাইয়া দিল। নিদ্রিত কলিকাতার বুকের উপর দিয়া পুলিশের গাড়ী তাঁহাকে কারাগারে লইয়া গেল।

সেইদিনই কলিকাতার অন্যত্র আর একদল পুলিশ হানা দিয়া একদল বাঙালী যুবককে গ্রেফতার করে। মাণিকতলার কাছাকাছি এক বাগান-বাড়ীতে পুলিশ এই দলকে গ্রেফতার করে। এই দলের মধ্যে ছিলেন, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন তরুণ বাঙালী। অনুসন্ধানের ফলে পুলিশ সেই বাগান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম এবং কিছু কিছু অস্ত্রও পাইল।

পরের দিন সংবাদপত্রে যখন সেই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন সমগ্র দেশ বিস্ময়ে জানিতে পারিল যে, ইংরাজ-শাসন-উচ্ছেদের জন্য একদল বাঙালী ছেলে নাকি এক বিরাট বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করিয়াছে। এই বিপ্লব-আন্দোলনের গুরু হইলেন অরবিন্দ, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার হইলেন দলের পরিচালক। সমগ্র দেশ তখন ইংরাজ-শাসনে অস্ত্রহীন, বাক্যহীন, দুর্ব্বল পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে সেই গুটিকতক বাঙালী ছেলের চরম দুঃসাহসিকতার কাহিনী শুনিয়া সমগ্র দেশ অন্তরে অন্তরে আনন্দ অনুভব করিল কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু প্রকাশ করিতে পারিল না। সমগ্র ভারতবর্ষ বিস্ময়ে বাংলার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

এই নব-জাগরণের যিনি গুরু, শ্রীঅরবিন্দ, আমাদের পরম সৌভাগ্য তিনি আজও আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। যে বাতাসে তিনি নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতেছেন, আমরাও সেই বাতাস গ্রহণ করিতেছি, ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের আর কিছুই নাই। কারণ এই মহাপুরুষ, শুধু যে সেদিন ভারতের রাজনৈতিক চেতনাকে জাগাইয়াছিলেন, তাহ নয, ভারতের যাহা অমর সম্পদ, ভারতের সেই আত্মিক সাধনাকে তিনি নিজের জীবনে, নিজের অপূর্ব্ব সাধনার দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুমহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। আজও সেই

সাধনায় তিনি মগ্ন এবং তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্য পাঠে আমরা জানিতে পারি, এই এটম্ বম্ আর বৈজ্ঞানিক অর্থ-শিকারের যুগে, এই মহাপুরুষ সমগ্র জগতের শান্তির জন্য, মুক্তির জন্য তপস্যায় নিরত। একদিন এই মানুষের মৃত্যু-পঙ্কিল জীবনে ভগবানের দিব্য আবির্ভাব সম্ভব, এই মানবই ঐশী শক্তির অধিকারী হইতে পারে, এই সুমহান্ আদর্শের কথা পথভ্রান্ত জগতের সম্মুখে শ্রীঅরবিন্দ তুলিয়া ধরিয়াছেন।

তাঁহার পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ সেকালের একজন মস্তবড় চিকিৎসক ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের সিভিল সার্জ্জন-রূপে তিনি অর্থ এবং প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন কিন্তু তাঁহার অন্তরের প্রবলতম বাসনা ছিল, তাঁহার পুত্রসন্তানদের সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা। সেই সময় আমাদের দেশের এক শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ধারণা ছিল, বিলাতী শিক্ষা ব্যতীত কেহ সভ্য হইতে পারে না। কৃষ্ণধন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন অরবিন্দ মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশু সেই সময় তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান এবং সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে শিশু-অরবিন্দকে রাখিয়া দিয়া আসেন। সেই শিশুকাল হইতে অরবিন্দ সেই বিলাতী পরিবারে লালিত-পালিত হন। ইংরাজ-শিশুদের সহিত তিনি লণ্ডনের বালক-বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করেন এবং কালক্রমে বাংলা ভাষা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। যে-ব্যক্তি পরবর্ত্তী কালে ইংরাজ-শাসনের অভিশাপের বিরুদ্ধে প্রাণান্ত সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন, দৈবের চক্রান্তে তিনি সেদিন সেই ইংরাজী সভ্যতার ক্রোড়েই মানুষ হন। তিনি যে-পরিবারে বাস করিতেন, তাঁহাদের খ্রীষ্টান নাম হইল অক্রয়েড্। অরবিন্দ তাঁহাদের সহিত এমনিই এক হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি তখন তাঁহার নাম লিখিতেন অক্রয়েড্ এ. ঘোষ।

স্কুলে এবং কলেজে তাঁহার মেধা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া যাইতেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কলেজে পড়িবার সময়ই তিনি য়ুরোপের প্রধান ভাষাগুলি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ান, ল্যাটিন এবং গ্রীক, ইংরাজী ভাষার মতনই তাঁহার নিকট সহজ ছিল। কলেজের পড়া শেষ করিয়া তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য পড়িতে লাগিলেন। পরীক্ষায় তিনি সাহিত্য এবং বিদেশী ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়ম হইল, কাগজে কলমে পরীক্ষার পর অশ্বারোহণ-পরীক্ষা দিতে হয়। অশ্বারোহণ করিবার সময় দৈবযোগে তাঁহার পা পিছলাইয়া যায় এবং এই সামান্য অজুহাতে তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করা হইল না। অনেকেই অনুমান করেন, এই ঘটনার মধ্যে দৈবের অভিপ্রায়ই বলবৎ হয়।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলে তিনি এদেশে আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে ইংরাজ-শাসনের চক্রের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া যাইতেন। আজ আমরা বুঝিতে পারি, তাঁহার এই পরীক্ষায় অমনোনীত হওয়া ভারতের পক্ষে ভালই হইয়াছিল। সেই সময় বারোদার মহারাজা এই প্রতিভাশালী তরুণ বাঙালীর প্রতিভায় আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের অন্যতম শিক্ষা-সচিবের পদ দান করেন। বিলাত হইতে এই ভাবে অরবিন্দ শিক্ষাকার্য্যের ভার লইয়া বরোদায় আগমন করেন।

বরোদায় আসিয়া তিনি জ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগ করিলেন। বিলাতে মানুষ হইলেও, তাঁহার অন্তর কিন্তু জন্মসূত্রে এই মাটীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল।

অনাড়ম্বর সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে তিনি জ্ঞানের অনুশীলনে

একেবারে ডুবিয়া গেলেন। গ্রীক্‌, হিব্রু, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ প্রভৃতি জগতের সমস্ত প্রধান ভাষার ধর্ম্ম, দর্শন ও সাহিত্যের মূলগ্রন্থগুলির পরিচয় লইলেন। এই সময় নিষ্ঠা-সহকারে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং সমগ্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ পড়িয়া শেষ করিলেন। এই শাস্ত্রপাঠের ফলে তাঁহার অন্তরে এক ঘোরতর বিপ্লব ঘটিয়া গেল। তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার মূলসূত্রের পরিচয় পাইলেন এবং সেই বিলুপ্ত ঐশ্বর্য্যকে দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন।

এই সময় বাংলাদেশ হইতে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁহার বাংলা ভাষার শিক্ষকরূপে বরোদায় তাঁহার নিকট আসেন। তাঁহার নিকট হইতে অরবিন্দ নূতন করিয়া মাতৃভাষা শিক্ষা করিলেন!

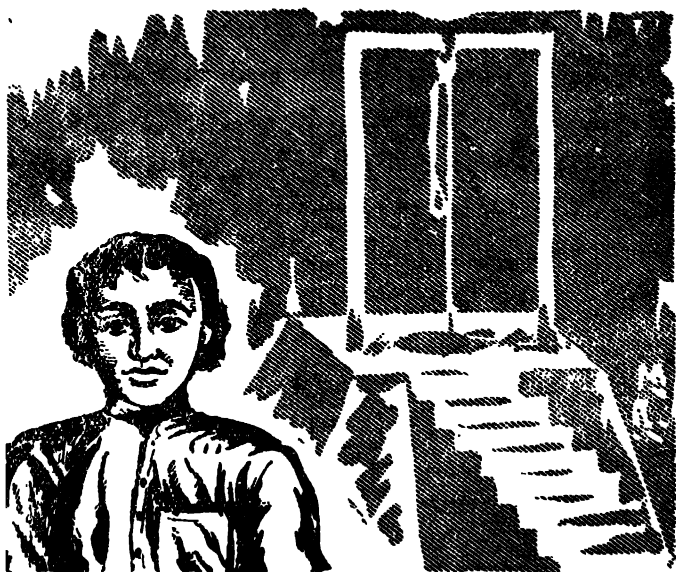
এই সময় মহারাষ্ট্র-অঞ্চলে যে গোপন-বিপ্লবীদল শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল, অরবিন্দ তাঁহাদের সংস্পর্শে আসেন। কথিত আছে যে, একজন সন্ন্যাসী নাকি এই দলের মন্ত্রগুরু ছিলেন। অরবিন্দও তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং স্বদেশের মুক্তি-সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন। এই মুক্তির আদর্শ প্রচার করিবার জন্য তিনি বাংলাদেশে আসেন। এবং "বন্দেমাতরম্" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে "বন্দেমাতরম্"এর দান অক্ষয় হইয়া আছে। ভারতের অতীত ঐশ্বর্য্যের কথা প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে এই কাগজে অরবিন্দ তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদও নির্ভীকভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের "কুইট্ ইণ্ডিয়া" প্রস্তাবের বহু আগে তিনি ঘোষণা করেন, ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ হইল, ইংরাজের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্জ্জন করা।

তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সেই সময়কার একদল তরুণ বাঙালী,

তাঁহাদের জীবন অকুণ্ঠভাবে দেশ-মাতৃকার সেবায় উৎসর্গ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার হইলেন এই তরুণ দলের নেতা। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত এই দেশব্যাপী জড়ত্বের ঘুম ভাঙ্গাইবার আর কোন পন্থা নাই। তাই তাঁহারা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন শহরে গোপন বিপ্লবী-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। এইসব কেন্দ্রে দলের যুবকদের গোপনে অস্ত্র-শিক্ষা দেওয়া হইত। যে-সব ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী কুশাসনের অত্যাচারে জীবনকে কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছিল, তাহাদের হত্যা করা ছিল, এই দলের প্রধান কাজ। অস্ত্র-নির্ম্মাণ এবং দল-গঠনের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা ডাকাতি দ্বারা অর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করেন। কলিকাতায় মুরারীপুকুরের বাগানে তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু বিস্তারের মুখেই এই দল ধরা পড়িয়া যায়। দীর্ঘকাল ধরিয়া আদালতে তাঁহাদের বিচার চলে। ইহাই আলিপুরের মামলা নামে ইতিহাসে বিখ্যাত। এই মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিনা-ফীতে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন এবং সেদিন আদালতে তিনি যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতেই তাঁহার নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। অরবিন্দ মুক্ত হইলেন কিন্তু বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ এই দলের অন্যান্য সভ্যদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইল। দ্বীপান্তরের আদেশ মাথায় লইয়া এই দুঃসাহসিকের দল হাতের লৌহ-শৃঙ্খল বাজাইয়া গান গাহিয়া উঠিল। তাঁহাদের উদ্যম একদিক হইতে ব্যর্থ হইয়া গেল বটে কিন্তু তাঁহাদের জীবনের সংস্পর্শে বাংলাদেশের মধ্যে যে গণ-চেতনা জাগিয়া উঠিল, তাহাকে কেহই আর রোধ করিতে পারিল না। বাংলার সেই অগ্নিমন্ত্রের প্রথম উপাসকের দল দূর আন্দামানে শৃঙ্খলিত হইয়া

রহিলেন বটে কিন্তু মৃত্যুভয়-ভীত এই নির্বীর্য্য দেশে তাঁহারা যে অভী-র আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহাই পত্রে-পুষ্পে-পল্লবে প্রস্ফুটিত হইয়া কালক্রমে স্বাধীনতা-মহামহীরুহের রূপ ধারণ করিল। এই তরুণ বাঙালীরা ভারতবর্ষকে মরিয়া অমর হইবার পথ দেখাইয়া গেলেন। তাঁহাদের দলের এক কিশোর বালক তাহার স্বল্পায়ু জীবনে সেই কথাই ভারতবর্ষকে বলিয়া গেল। সেই কিশোরের নাম ক্ষুদিরাম। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার কাহিনী বর্ণিত হইতেছে।



অমর কিশোর ক্ষুদিরাম

মজঃফরপুর শহরের রাস্তার ধারে দু'জন তরুণ বাঙালী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল। যেন তাহারা কাহারও অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময় একটা গাড়ী তাহাদের সামনের রাস্তায় দেখা দিল। গাড়ীটি কাছাকাছি আসিতেই, তাহারা তাহার উপর বোমা নিক্ষেপ করিল। সেই গাড়ীর ভিতরে দুইজন য়ুরোপীয় মহিলা ছিলেন। সেই বোমার আঘাতে তাঁহারা নিহত হইলেন।

যদি এই ঘটনাটি কোন সংবাদপত্রে এমনি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাহা পাঠ করিয়া, সেই বোমাবর্ষণকারী তরুণ দুইজনের প্রতি অশ্রদ্ধাই হয়। বিশেষ করিয়া যখন জানিতে পারি যে, দুইজন নিরীহ মহিলা সেই আক্রমণের ফলে প্রাণ দিতে বাধ্য হন। এবং এই ঘটনাটুকুর

জন্য কাহাকেও একটা জাতির ইতিহাসে সম্মানের স্থায়ী স্থান দিবার কোন হেতু থাকে না।

অথচ সেই দু'টি তরুণ, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। একজনের নাম প্রফুল্ল চাকী, আর একজনের নাম ক্ষুদিরাম। বাঙালী তরুণের কাছে ক্ষুদিরামের চেয়ে প্রিয় নাম আর নাই বলিলেই চলে। পল্লীগ্রামে ভিক্ষুকেরা পর্য্যন্ত তাহার নামে গান বাঁধিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ক্ষুদিরামের নামে কৃপণতম গৃহস্থও ভিক্ষুককে কিছু না কিছু দিয়া ধন্য বোধ করিয়াছে। কেন তাহা সম্ভব হইল? ইহার মধ্যে কি তাৎপর্য্য নিহিত আছে? স্থানকালপাত্র-ভেদে এই জগতে প্রত্যেক জিনিসের মূল্য ধার্য্য হয়। একদিন দশটা কড়ি দিয়া এক হাঁড়ি চাউল পাওয়া যাইত, আজ তাহা রাস্তায় পড়িয়া থাকিলেও কেহ চাহিয়া দেখে না। এমন একদিন ছিল যখন, যদি কেহ কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে যাইতে চাহিত, তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা ভয়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিত। আজ লোকে কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান ডেলী-প্যাসেঞ্জারী করিতেছে। একদিন শুধু মোগল-সম্রাটের মতন ঐশ্বর্য্যশালী লোক বরফ খাইতে পারিত, আজ রাস্তার ভিখারীরাও তাহা অনায়াসে পাইয়া থাকে।

ক্ষুদিরাম যেদিন রাস্তায় দাঁড়াইয়া বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেদিন ভারতবর্ষের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়াইয়া বন্দেমাতরম্ বলিতেও কাহারও সাহসে কুলাইত না। সেদিন বৃটিশ-রাজশক্তি মহাশক্তিশালী দৈত্যের মতন আমাদের সমস্ত চেতনাকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া ছিল যে তাহার বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করার মধ্যে পর্য্যাপ্ত সাহসের প্রয়োজন হইত। সমস্ত দেশ একটা সর্ব্বব্যাপী ভয়ের প্রেত-ছায়ায় আচ্ছন্ন ছিল। ক্ষুদিরাম সেই বৃহৎ ভয়কে তুচ্ছ করিবার পথ দেশবাসীকে প্রথম দেখাইল। জাতির ভয়ত্রাতা-রূপে তাই আজ সেই তরুণকে আমরা স্মরণ করি।

তাহা ছাড়া, ক্ষুদিরাম অন্য আর এক কারণে প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। যেভাবে এই তরুণ কিশোর তাহার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাকে বহন করিয়া গিয়াছে, তাহার জন্যই তাহার নাম আজ মৃত্যুঞ্জয়ী অমর পুরুষদিগের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। পরাধীন জাতির জীবনে মৃত্যু-ভয়ের তুল্য দুর্ব্বলতা আর কিছু নাই। ব্যক্তিগত জীবনেও, আমাদের শাস্ত্রে বলে, যে-মানুষ মৃত্যু-ভয়ের উর্দ্ধে উঠিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বজয়ী। ক্ষুদিরাম যেভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন, তাহার মধ্যেই সেই ভয়কণ্টকিত যুগে দেশের তরুণেরা স্বাধীনতা-অর্জ্জনের মন্ত্রের প্রত্যক্ষ সন্ধান পাইল। তাই সেই স্বল্পায়ু কিশোরের মধ্যে বাঙালী ছেলেরা তাহাদের মৃত্যুঞ্জয়ী দিব্যমূর্ত্তির প্রকাশ দেখিতে পাইল। তাই বাঙালী তারুণ্যের মূর্ত্ত প্রতীকরূপে ক্ষুদিরাম বাঙালীর অন্তরে চিরশ্রদ্ধার আসনে সমাসীন হইয়া আছে।

বাংলার নব-জাগরণের ইতিহাসে মেদিনীপুর একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। দুরন্ত সন্তানের ধাত্রীরূপে মেদিনীপুর চিরবিখ্যাত। এই মেদিনীপুরেই ক্ষুদিরামের জন্ম, বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইতে তখন মাত্র এগারো বৎসর বাকি। কংগ্রেসের বয়স তখন মাত্র চার বৎসর। চার বৎসরের শিশু-কংগ্রেস ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারীদিগের হাত ধরিয়া হাঁটিতে শিখিতেছে।

ক্ষুদিরামের বয়স যখন মাত্র ছয়, সেই সময় বালক মাতাপিতাহীন অনাথ হইয়া পড়ে। তাহার লালন-পালনের ভার লইলেন তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরের স্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ করে।

সেই সময় বাংলাদেশে এক নূতন প্রাণের জোয়ার আসে। অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ তখন সংবাদপত্র এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশের মুক্তির আদর্শকে দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া

ধরিতেছিলেন। ইহার কিছুকাল আগে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখিয়াছিলেন। এই উপন্যাসে তিনি কৌশলে দেশের স্বাধীনতা-অর্জ্জনের জন্য গুপ্ত-সমিতি গঠনের ইঙ্গিত করিয়া যান। এবং দেশবাসীকে স্বাধীনতা-যজ্ঞের মন্ত্রস্বরূপ "বন্দেমাতরম্"-বাণী দান করিয়া যান। তাহারই প্রভাবে দেশের অভ্যন্তরে তখন গোপনে বিপ্লবীরা সমিতি গঠন করিতেছিলেন। অরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে তখন এক বিরাট বিপ্লবী-চক্র গড়িয়া উঠে। এই চক্রের প্রধান পরিচালক ছিলেন বারীন্দ্রকুমার। তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা দেশের মধ্যে সমধর্ম্মী তরুণদের খুঁজিয়া বেড়াইতেন। ক্ষুদিরাম ছাত্রাবস্থায় এই দলের সংস্পর্শে আসে এবং দেশের মুক্তি-সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

কিন্তু এই বিপ্লবী-চক্রে সহসা বাহির হইতে কাহাকেও লওয়া হইত না। এই দলে যাহাদের লওয়া হইত, তাহাদের প্রথমে বহুভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইত। এইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তখন মৃত্যু-শপথ করিয়া রীতিমত দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইত। এই দীক্ষার পর গোপন-চক্রের সভ্যরূপে তাহাকে গ্রহণ করা হইত।

ক্ষুদিরাম এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেই কিশোর বয়সেই সংসারের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কলিকাতায় বারীন্দ্রকুমারের চক্রে যোগদান করিল। এই চক্রের কার্য্যবিধির মধ্যে একটা প্রধান বিষয় ছিল, অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীদের হত্যা করা।

সেই সময় কলিকাতা শহরে কিংস্‌ফোর্ড নামে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহারই এজলাসে প্রধান রাজনৈতিক মামলার বিচার হইত। তাঁহার কঠোরতার দরুণ বিপ্লবীদের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। বিপ্লবীদের চক্রে তাঁহাকে হত্যা করার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

এই দায়িত্ব পালনের জন্য বারীন্দ্রকুমার ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীকে মনোনীত করিলেন। কিংস্‌ফোর্ড তখন মজঃফরপুর শহরে বদলী

হইয়া গিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া সেই শহরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং সুযোগের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন তাহারা খবর পাইল যে, কিংস্‌ফোর্ড গাড়ীতে করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহাদের খবর যে-কোন কারণে ভুল হইয়া যায়। যে গাড়ীতে তাহারা অনুমান করিয়াছিল যে কিংস্‌ফোর্ড সাহেব আছেন, দৈবক্রমে সেই গাড়ীতে তখন মিসেস্ কেনেডী নামক একজন মহিলা এবং তাঁহার কন্যা যাইতেছিলেন। তাই যে বোমা পড়িবার কথা কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের উপর, তাহা বর্ষিত হইল সেই দু'জন নিরীহ মহিলার উপর।

প্রফুল্ল এবং ক্ষুদিরাম তৎক্ষণাৎ দুইজনে দুই পথ ধরিয়া অন্তর্হিত হইল। কিন্তু প্রফুল্ল মোকামা ষ্টেশনের নিকট গুপ্তচরের হাতে ধরা পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া আত্মহত্যা করিল। ক্ষুদিরামও পথের ধারে এক দোকানে হঠাৎ ধরা পড়িয়া যায় এবং শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাহাকে কারাগারে লইয়া আসা হয়।

বিচারের সময় সে অকপটে সমস্ত কথা নিজের মুখেই বলিল। অন্যায় ব্যবহারের উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য সে এই কার্য্য করিতে গিয়াছিল। এবং তাহার জন্য সে গর্ব্বিত।

পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার নিকট হইতে আর কোন সংবাদ বাহির করিতে পারিল না। বিচারক যখন ফাঁসির হুকুম দিলেন, তখন সে সত্যই অবিচলিতভাবে তাহা গ্রহণ করিল। মৃত্যু-ভয়কে সে জয় করিয়াছিল। ফাঁসির মঞ্চে সে ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হয় এবং নিজের হাতে ফাঁসির রজ্জু লইয়া উল্লাসে বন্দেমাতরম্-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিজের গলায় পরিয়া লয়।

তাহার সেই আনন্দিত আত্মদানের রক্ত-রঙে বাংলার উদয়-আকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল।



সুরেন্দ্রনাথ

সুরেন্দ্রনাথের নাম ইংরাজী অক্ষরে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া, সে-যুগের লোকে তাঁহাকে Surrender Not বলিয়া উল্লেখ করিত। প্রকৃতপক্ষে সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হইল, যোদ্ধার বৈশিষ্ট্য, যুদ্ধে পরাজয়-স্বীকার না করা, বশ্যতা-স্বীকার না করা। তাঁহার সমগ্র জীবন হইল, একটা অবিরাম সংগ্রাম; কখনও বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে, কখনও বা স্বদেশী সহযাত্রীর বিরুদ্ধে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তিনি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতে জানিতেন না; সর্ব্বদা বীর-নীতি অনুসরণ করিয়াই তিনি যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কখনও জয়লাভ করিয়াছেন, কখনও বা পরাজিত হইয়াছেন কিন্তু জয়-পরাজয়ের উর্দ্ধে তাঁহার মন সর্ব্বদাই

দেশের কল্যাণের দিকে চাহিয়া থাকিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের তরুণদের মানসিক জড়তা দূর করিয়া তিনি তাঁহাদের এই সংগ্রাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যান।

তাঁহার পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার প্রবল বাসনা ছিল যে, পুত্রকে তিনি বিলাতে পাঠাইয়া সেখানকার উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া আনিবেন। এই বাসনা তাঁহার চিত্তে এত প্রবল ছিল যে, সুরেন্দ্রনাথ যখন শিশু সেই সময়ই তিনি তাঁহার উইলে পুত্রের বিলাতী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন কারণ যদি অকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে হয়ত অর্থাভাবে তাঁহার সেই বাসনা পুত্র সফল করিতে পারিবে না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তিনি জীবিত থাকিয়াই যথাকালে পুত্রকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাইলেন। একই জাহাজে তিনজন তরুণ বাঙালী ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন, এই তিনজনই বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরজীবী হইয়া আছেন, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তখন বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ছাত্র হইতে হইলে, তাহার পূর্ব্বে একটা নির্ব্বাচনমূলক পরীক্ষা দিতে হইত। এইখান হইতেই সুরেন্দ্রনাথের জীবনে সংগ্রাম শুরু হইল। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নির্ব্বাচকমণ্ডলী সুরেন্দ্রনাথকে বয়সের অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার বয়স নাকি নির্দ্দিষ্ট বয়সের কয়েক মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্য ছাত্র হইলে সে-অবস্থায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িত। সুরেন্দ্রনাথ মনে মনে দুঃখিত হইলেন বটে কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। বিচারে তিনি নিজেই নিজের পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং বিচারকদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভারতীয় গণনা-অনুযায়ী তাঁহার বয়স নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যেই আছে।

বিচারকগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় বসিবার অধিকার দিলেন। কিন্তু এইসব ব্যাপারে প্রায় এক বৎসর কাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যে কয়েক মাস হাতে আছে, তাহার মধ্যে সিভিল সার্ভিসের মতন কঠিন পরীক্ষার সমস্ত পাঠ্য আয়ত্ত করা রীতিমত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি সেই কয়েক মাসের মধ্যেই এমনভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিলেন যে, পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল, তিনি রীতিমত কৃতিত্বের সহিতই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সিলেটের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে তিনি সিভিল সার্ভিসের লৌহ-চক্রের সহিত সংযুক্ত হইলেন। ইংরাজ-সরকার এইসব সিভিল সার্ভিসের বিলাতী-ভাবাপন্ন কর্ম্মচারীদের সাহায্যেই ভারতবর্ষের শাসন-ব্যাপার পরিচালনা করিত। সুতরাং এই বিভাগে যাঁহারাই আসিতেন, তাঁহাদের সরকারের হুকুম মাফিক চলিতে হইত। সাধারণতঃ সিভিল সার্ভিসের যিনি সিনিয়র অফিসর, তাঁহারই তালে তাল দিয়া চলিতে হইত। এই সিনিয়র অফিসর একজন ইংরাজই থাকিতেন। এই ভাবে বিলাতী অফিসরগণ নিজেদের একটা দল করিয়া লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেন। যাহারা এই দলের হুকুম মানিয়া চলিত, তাহারাই উন্নতি করিতে পারিত। নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার স্থান সেখানে ছিল না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি কার্য্যে যোগদান করিয়াই এই বিলাতী অফিসরদের চক্রের ব্যাপার অবগত হইলেন। কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে নিজের মতামত বজায় রাখিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অচিরকালের মধ্যেই বিলাতী সহকর্ম্মিগণ এই কালা-আদমীর স্বতন্ত্র ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সেই সময় বিভাগীয় পরীক্ষার ফলে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহকর্ম্মী অনেক ইংরাজ-অফিসরকে

ছাড়াইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলেন এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের উপরের আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা মনে মনে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। একজন "নেটিভ" তাঁহাদের ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া যাইবে! এ অসহ্য! তাঁহারা গোপনে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন, যেমন করিয়াই হোক্ এই দুর্বিনীত নেটিভ্‌কে অপদস্থ করিয়া সিভিল সার্ভিস হইতে তাড়াইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা চর নিযুক্ত করিলেন, সুরেন্দ্রনাথের কাজের ত্রুটি বাহির করিবার জন্য। একান্ত দুঃখের বিষয়, পরাধীন দেশে এই হীন কার্য্য করিবার মত লোকেরও অভাব হয় না।

সাধারণতঃ উচ্চ-রাজকর্ম্মচারীদের অনেক সময় তাঁহাদের কেরানীর উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। সমস্ত কাগজ তন্নতন্ন করিয়া পড়িয়া সই করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না, কেরানী বা মুহুরী সই করিতে বলিলেই সই করেন। এই ভাবে তাঁহার এক মুহুরীর দোষে, একটা ভুল আদেশ তিনি দিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ চরের মারফত সেই কথা সিনিয়র ইংরাজ-অফিসরের কানে গিয়া পৌঁছাইল। তিনিও এই সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। যদিও অতি সামান্য ত্রুটি, কিন্তু আইনের দিক হইতে তাহা গুরুতর অপরাধ। সেই ইংরাজ-অফিসর তৎক্ষণাৎ সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। অনুসন্ধানের ফলে সুরেন্দ্রনাথের দোষ স্বীকৃত হইল। সিভিল সার্ভিস হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দিবার জন্য বিলাতে আবেদন চলিয়া গেল।

এখানকার বিচারে ব্যর্থ হইয়া সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য দাঁড়াইলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের কথা তাঁহাদের কাণে গিয়া পৌঁছাইয়াছিল, তাই সুরেন্দ্রনাথের সমস্ত আবেদন সত্ত্বেও, তাঁহাকে এই সামান্য কারণে সিভিল সার্ভিস হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইল। সারাজীবনের সাধনা এই ভাবে

জীবনের আরম্ভ-মুখে ব্যর্থ হইয়া গেল। যে-কোনও লোক এই নিষ্ঠুর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িত, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ মনে মনে যতই দুঃখিত হউন না কেন, এই ঘটনার মধ্যে তিনি যেন দৈবের অঙ্গুলী-সঙ্কেত দেখিতে পাইলেন। এই অবিচারের ছিদ্রপথ দিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসনের প্রকৃত রূপ। যে-অবিচারে আজ তাঁহাকে জীবনের যাত্রামুখে পঙ্গু হইয়া যাইতে হইল, তাহারই প্রাণহীন ব্যাপক আক্রমণে শতসহস্র ভারতবাসীর জীবন প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশই পাইতেছে না। নিজের দুঃখ ভুলিয়া, সেই দেশব্যাপী বিরাট দুঃখের দিকে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। সেই দুঃখের মধ্যে, সেই অবিচারের মধ্যে, তাঁহার রিক্ত, দরিদ্র দেশবাসীর সঙ্গেই তাঁহার আসন। ম্যাজিষ্ট্রেটের উচ্চ-আসন হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিয়া দৈব যেন তাঁহাকে সেই পথই দেখাইয়া দিল। তবুও তিনি স্থির করিলেন, ব্যারিষ্টারী পড়িয়া তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিবেন। কিন্তু তাহার অনুমতি পাইলেন না। তখন বুঝিলেন, তাঁহার ভাগ্য তাঁহাকে সরকারী কর্ম্মচারীর রাজপথ হইতে জনতার জীবনের কণ্টকিত প্রান্তরেই লইয়া যাইতে চায়। হতাশায় ভাঙ্গিয়া না পড়িয়া, তেমনি মাথা উঁচু করিয়াই তিনি সেই পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আনন্দিতচিত্তে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইলেন এবং যে-অবিচারে সমগ্র দেশ আহত ও পঙ্গু হইয়া আছে, সেই অবিচারের বিরুদ্ধে দেশের চেতনাকে জাগ্রত করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন।

সামান্য শিক্ষকের জীবন বরণ করিয়া লইয়া তিনি দেশের যুবকদের সম্মুখে স্বাধীনতার আদর্শকে তুলিয়া ধরিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী তিনি য়ুরোপের সাহিত্য হইতে ভারতীয় ছাত্রদের মনে রোপণ করিলেন। অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

সেই সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে লর্ড কার্জন এক মহাবিপত্তি লইয়া আসিলেন। বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বাঙালীর অস্তিত্বের মূলে তিনি আঘাত করিলেন। লর্ড কার্জনের সেই বঙ্গ-ভঙ্গকে রদ করিবার জন্য বাঙালী তরুণেরা দুর্জয় পণ গ্রহণ করিল। সুরেন্দ্রনাথের সংগ্রামশীল চিত্ত সেই পরিস্থিতিতে যুদ্ধাশ্বের মত সজাগ হইয়া উঠিল। বাংলার সেই তরুণ-চিত্তের নব-জাগ্রত বিদ্রোহের তিনিই হইলেন নায়ক। সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি অগ্নিবাণী ছড়াইয়া চলিলেন। পাঞ্জাব হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ সেদিন এই বীর বাঙালীর কম্বুকণ্ঠে অনুরণিত হইয়া উঠিল।

ঈশ্বর-দত্ত এক অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে-কণ্ঠস্বর যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি কখনও আর তাহা ভুলিতে পারিবেন না। মেঘের মত তাহার আওয়াজ, অগ্নির মত তাহার দীপ্তি, তলোয়ারের মত তাহার ধার, তীরের মত তাহার তীক্ষ্ণতা। সেই কণ্ঠস্বরে সমগ্র ভারতবর্ষ যুগ-যুগান্তব্যাপী নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। এত-বড় বক্তা ভারতবর্ষে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। অরবিন্দ যে-সাধনার ধর্ম্ম-গুরু, সুরেন্দ্রনাথ হইলেন তাহার প্রচারক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিজয়-দুন্দুভি ধ্বনিত হইয়া উঠিল তাঁহার কণ্ঠে। রাজপুরুষেরা তাহাকে গলা টিপিয়া স্তব্ধ করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু অদৃশ্য মহাশক্তির মত তাহা বাতাসে বাতাসে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাঙালী তরুণেরা তাঁহাকে তাহাদের হৃদয়ের রাজারূপে অন্তরে অধিষ্ঠিত করিল। তাঁহার ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া তাহারা নিজেরা কাঁধে করিয়া সেই গাড়ী টানিয়া লইয়া নিজেদের ধন্য বোধ করিয়াছে।

উচ্চশিক্ষার প্রচারের জন্য নিজের চেষ্টায় একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা করিলেন, রিপণ কলেজ। এবং জাতির মর্ম্মকথা প্রকাশের জন্য "বেঙ্গলী" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। যখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট

বুঝিলেন যে, স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার হইতে এই জাতিকে আর বঞ্চিত করিয়া রাখা চলে না, তখন তাঁহারা পুরাতন শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন করিবার জন্য নূতন আইনের প্রবর্ত্তন করিলেন। সেই নূতন শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের হাতে ক্রমিক পর্য্যায়ে স্বাধিকার দিবার ব্যবস্থা হইল। সুরেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন, সেই আইনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন শিক্ষা করিতে হইবে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইতে হইলে, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে উপযুক্ততা-অর্জ্জনের ক্রমিক ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু তখন দেশের মধ্যে পূর্ণ-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে।

এইখানেই তাঁহার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। এতদিন তিনি বিদেশী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন, এখন শুরু হইল স্বদেশবাসীর সহিত সংগ্রাম। সেদিনও তিনি যেমন নির্ভীকভাবে যোদ্ধার নীতি অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, আজও সেই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি নূতন সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। নূতন শাসন-সংস্কারের প্রথম মন্ত্রি-রূপে তিনি দেশের ভিতর গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। সম্পূর্ণ নূতনভাবে মিউনিসিপ্যাল আইনের গঠন করিলেন এবং এতদিন যে কলিকাতা করপোরেশনে ইংরাজ-কর্ম্মচারীদিগের আধিপত্য ছিল, সেখানে তিনি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু একদিন যাহারা তাঁহাকে কাঁধে করিয়া বহন করিয়াছে, একদিন যাহাদের রাজনৈতিক চেতনা তিনিই জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, আজ তাহারাই তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া অপমান করিতে উদ্যত হইল। এবং একদিন, জনতা হইতে একজন তাঁহাকে জুতা ছুঁড়িয়া মারিল। এই বর্ব্বর অসহিষ্ণুতা তাঁহার অন্তরে গিয়া আঘাত করিল।

চির-যোদ্ধা তিনি। যুদ্ধ কোনদিন তাঁহাকে গহ্বর-আশ্রয়ী করে

নাই। নূতন দিনের নির্ব্বাচনে দেশবন্ধুর পরিচালনায় নূতন কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। সংগ্রাম নূতন পর্য্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, নূতন যোদ্ধার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই, বৃদ্ধ যোদ্ধা নূতন সৈনিকদের হাতে পতাকা তুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেদিন যাহারা তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছিল, আজ তাহারা অনুতপ্ত চিত্তে তাঁহার আত্মার নিকট ক্ষমা চাহিতেছে।

রাজনৈতিক যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে যোদ্ধার যোগ্য সম্মান দেওয়া, বীরত্বেরই ধর্ম্ম। সুরেন্দ্রনাথের জীবনী সেই কথাই যেন আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়।



রবীন্দ্রনাথ

আজিকার যুগের তরুণ অধিবাসীদের নিকট রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি, যে-কবি প্রাণের শঙ্খে ফুৎকার দিয়া ভারতবর্ষের চেতনাকে জাগাইয়া গিয়াছেন, যিনি মানবতার ক্ষেত্রে বিশ্ব-মানবের মিলন-স্বপ্নকে অগ্রবর্ত্তী বাণী-রূপ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একদা যখন বাংলাদেশ বঙ্গভঙ্গ-অভিশাপকে দূর করিবার জন্য শতাব্দীর জড়তাকে দূরে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল সেই সময়, সেই বিংশ শতাব্দীর জন্ম-লগ্নে, রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে সেই জাতীয় আন্দোলনের পুরোহিত-রূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার সেই রাজনৈতিক জীবন তাঁহার কাব্য-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের মাটির সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধকে চিরকালের মত



প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার কাব্য-জীবন তাঁহার সেই বিরাট কর্ম্ম-জীবনকে সাধারণ লোকের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যেন সরাইয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য আজকালকার অনেকের ভ্রান্ত ধারণা যে, রবীন্দ্রনাথ বুঝি শুধু ভাব-ধর্ম্মী কবি। তাহাতে অবশ্য তাঁহার মহত্ত্বের কোনও হানি হয় না। কিন্তু তাহা সত্য নয়। তাঁহার জীবন ও কবিতা সমধর্ম্মী। এবং এক বিরাট কর্ম্মের ভিত্তির উপরই তাহাদের প্রতিষ্ঠা। এতবড় অনলস কর্ম্মী জাতির ইতিহাসে খুব বেশী দেখা যায় না। কবির জীবনের এইসব উপকরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। যেদিন সংগৃহীত হইবে, সেদিন দেখা যাইবে, জাতির কর্ম্মীদের প্রথম লাইনেই তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। কবির চরিত্রের সেই উপেক্ষিত দিকটার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাই তাঁহার কাব্যের পরিচয় এখানে নাই।

নিজের এই কর্ম্ম-জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, "দেশের জন্য আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করে ছিল, ছন্দোবদ্ধরূপেই শুধু তা প্রকাশ পায়নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে। এর জন্যে সর্ব্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সর্ব্বস্ব খুব বেশী ছিল না। যতটুকু ছিল, ততটুকুই নিঃশেষে উজাড় করে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে, দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্যে দিনের পর দিন অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সভা করে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছি। এক মুহূর্ত্ত নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না। আমাদের কাজ ছিল কি? কি ছিল না, তাই ভাবি। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে দৃষ্টি ছিল আমাদের। দেশীয় বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে দেশীয় সমবায় ভাণ্ডার পর্য্যন্ত সব কিছুরই পত্তন করেছিলাম।

শিল্প ও সাহিত্যের প্রসারচেষ্টা তো ছিলই, পল্লীমঙ্গল, পল্লীসংগঠন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তার, কুটীর-শিল্প ও কলকারখানার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যাবতীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ আমরা করিনি কি ?"

রবীন্দ্রনাথ খালি পায়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন, মাঠেতে চাষীদের সহিত চাষবাস দেখিতেছেন, এই চিত্র কল্পনা করিতে তোমরা অভ্যস্ত নও, কিন্তু ইহা সত্য। স্বদেশী যুগে তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের নিদর্শন হইল, রাখি-বন্ধন, শিবাজী-উৎসব, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ। তাঁহার শেষ-জীবনের কর্ম্ম-নিদর্শন হইল, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন এবং বিশ্বভারতী। একটা জীবনে এতগুলি জাতি-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান যিনি স্বহস্তে গড়িয়া যাইতে পারিয়াছেন, কর্ম্মী হিসাবে তাঁহাকে প্রণাম না জানাইয়া কাহাকে জানাইব ?

বঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া লর্ড কার্জন বাঙালী জাতির একত্বের মূলে আঘাত করেন। তাহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অগ্রণীরূপে আগাইয়া আসেন। একদিকে তাঁহার কলম হইতে যেমন বাংলাদেশের অন্তরের অবিনাশী ঐশ্বর্য্যের রূপ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, অন্যদিকে বাস্তব জীবনে সেই আদর্শকে রূপ দিবার জন্য রাখি-বন্ধন উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন। বাঙালীর অন্তর হইতে পূজার মন্ত্রের মত ধ্বনিয়া উঠিল,—

"আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সকলের সঙ্গে মিলিয়া উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া শুভ্রবস্ত্রে পথে দাঁড়াইয়া পথিকের হাতে মিলনের রাখি বাঁধিয়া দিতে

লাগিলেন। সারাদেশ জুড়িয়া তরুণেরা সেই ভাবে পরস্পর পরস্পরের হাতে রাখি বাঁধিয়া দিল। এই সামান্য একটুকু রঙীন সূতার মধ্যে বাঙালী জাতির একত্বের আদর্শ অক্ষয় মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিল।

সেদিন বাঙালীর অন্তরে যে ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ জানিতেন, বাঙালীর স্বভাব-দোষে তাহা হয়ত শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসেই থাকিয়া যাইবে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের কারণ আর কিছু হইতে পারে না। আমাদের জাতীয় ত্রুটির এই বিশেষ লক্ষণ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। আমাদের শত সাধু-ইচ্ছা সত্ত্বেও, আসল কার্য্যক্ষেত্রে আমরা একনিষ্ঠভাবে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারি না। তাই সেই ভাব-মুখে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব কর্ম্মীর মত সে-যুগের তরুণদের সামনে কর্ম্মের ধর্ম্মের কথা স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "দেশের যে-সমস্ত যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের প্রতি একটি মাত্র পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেল, স্থির হও, কোন কথা বলিয়ো না, অহরহ অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্ব্বল করিও না। আর কিছু না পার খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে-কোন একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া, যাহাকে কেহ কোন-দিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার সামগ্রী নহে। তাহাকে অজ্ঞান হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ-সংস্কার হইতে রক্ষা কর—।"

সেদিন যে-ত্রুটির সম্পর্কে তিনি সে-যুগের তরুণদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন তাহা আজও সত্য হইয়া আছে। সেদিন দেশ-সেবার যে-আদর্শ তিনি আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাই হইল আজিকার প্রধান কর্ম্ম-ব্যবস্থা। তাঁহার সত্যদৃষ্টিতে তিনি বুঝিয়া-

ছিলেন, বাংলার পল্লীর মধ্যে যাইয়া বাস্তব কর্ম্মের মধ্য দিয়া পল্লীকে উন্নত না করিলে, দেশের মুক্তির কোন অর্থই থাকিবে না। পল্লীবাসী কৃষক এবং মজুরদের মধ্যে সমানভাবে মিশিতে হইবে, মানুষ হিসাবে তাহাদের মর্য্যাদাকে প্রত্যক্ষ জীবনে স্বীকার করিতে হইবে। আজিকার সাম্যবাদীদের এবং আধুনিক রাজনৈতিকগণের যোগ্য পূর্ব্বপুরুষ-রূপে রবীন্দ্রনাথ দেশের মুক্তির জন্য যে কর্ম্ম-ব্যবস্থার সেদিন ভাষায় এবং প্রত্যক্ষ জীবনে রূপ দিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যেই জাতির স্থায়ী কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের আদর্শ ছিল, একটি ছোট্ট পরিধির মধ্যে, গোটাকতক গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া, গঠনমূলক কার্য্য করিয়া যাওয়া। যদি এই ভাবে প্রত্যেক কর্ম্মী এক একটি কেন্দ্র স্থির করিয়া লইয়া, আপন আপন শক্তি-অনুযায়ী ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যেই গঠনমূলক কার্য্য লইয়া অগ্রসর হয়, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যেই দেশের চেহারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। সরকারের সাহায্যের দিকে চাহিয়া বসিয়া না থাকিয়া, কিংবা কোন বৃহৎ আয়োজন ও অর্থের ভরসায় না থাকিয়া, এই ভাবে প্রত্যেককেই আপন আপন ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যেই একটা কর্ম্ম-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং একান্ত নিষ্ঠা-সহকারে তাহা পালন করিয়া যাইতে হইবে।

এই আত্ম-নির্ভরতা, এই কর্ম্ম-নিষ্ঠার শিক্ষা তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন, শুধু তাঁহার অপরূপ সাহিত্যের ভিতর দিয়া নয়, প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব উদাহরণের দ্বারাও। এই সময় তিনি যে অপরূপ সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইল ভারতবর্ষের বর্ত্তমান যুগের কর্ম্ম-সংহিতা। বাস্তব জীবনে গুটিকতক অনুচরকে লইয়া তিনি পল্লী-সেবা-ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাংলাদেশের জমিদারদের তিনি অনুরূপ কর্ম্ম-ব্রতে আহ্বান

করিলেন। সেই সঙ্গে পথপ্রদর্শক-রূপে তিনি তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত কালিগ্রাম পরগণায় একটি কর্ম্ম-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিলেন। সেই কর্ম্মি-সঙ্ঘের নেতা হইলেন অতুল সেন। কবি নিজে এই সঙ্ঘের কার্য্য-তালিকা প্রস্তুত করিলেন।

মোটামুটিভাবে সেই কার্য্য-তালিকাকে পাঁচটি বিভাগে ভাগ করা যায়—(১) চিকিৎসা-বিধান, (২) প্রাথমিক শিক্ষাদান, (৩) পল্লীর পথ-ঘাট, কূপ ইত্যাদির সংস্কার এবং পত্তন, জঙ্গল পরিষ্কার করা, (৪) ঋণদায় হইতে চাষীদের মুক্তি দিবার জন্য সমবায় ব্যবস্থা, (৫) সালিশী বিচারের দ্বারা কলহের নিষ্পত্তি। পূর্ণ-উদ্যমে এই কাজ চলিতে থাকে। তোমরা শুনিলে হয়ত বিস্মিত হইবে যে, এই কর্ম্মি-সঙ্ঘের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ দুই শতাধিক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

অসহযোগ-আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে বাংলার কবি পল্লী-গঠনের কাজে যে কর্ম্ম-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন, পরবর্ত্তী কালে কংগ্রেস সেই একই পন্থা অনুসরণ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন এই পল্লী-সংস্কারের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল, সেই সময় পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল। নানাপ্রকারের বাধা সত্ত্বেও তিনি অগ্রসর হইয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু শেষকালে পুলিশ আইনের চরম দণ্ড প্রয়োগ করিয়া প্রধান কর্ম্মী অতুল সেনকে অন্তরায়ণে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের কাজের উপরই মনঃসংযোগ করিলেন। সেই সঙ্গে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন-সাধনের জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং নিজে সেখানে শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার সমস্ত উদ্যম এই শিক্ষা-নিকেতনকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সম্পূর্ণ সহায়হীন অবস্থায় তিনি এই

গুরুভার কার্য্য নিজের স্কন্ধে একাই বহন করিয়া গিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক জগতে ভারতের মর্য্যাদাকে ফিরাইয়া আনিতে, ভারতের বাণীকে পুনরায় জগৎগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে, ভারতের বিশিষ্ট জ্ঞান-সাধনার ধারাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে, শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে অক্লান্ত সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার যোগ্য মূল্য নির্দ্ধারণ অনাগত ঐতিহাসিকরা একদিন করিবেন। সেদিন দেখা যাইবে, ভারতের এই কবি, ভারতের মুক্তি-সাধনার বাস্তবক্ষেত্রে কি অমূল্য দানই না রাখিয়া গিয়াছিলেন।



স্বাধীনতা-সংগ্রামের নূতন রূপ

মহাত্মা গান্ধী

বর্ত্তমান জগতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে, দুইজন অতি-মানবের আবির্ভাব একই যুগে, এই শতাব্দীর সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। এই দুই মহাপুরুষের চিন্তাধারা এবং কর্ম্মপ্রণালী সমগ্র জগতের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, অনাগত শতাব্দীর পৃথিবী তাহারই প্রেরণায় অগ্রসর হইবে। এই দুই মহাপুরুষের চিন্তাধারাই আগামী দিনে জগতের প্রত্যেক জাতির জীবন-গঠনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করিবে। একজন হইলেন লেনিন, সোভিয়েট রাশিয়ার জনক, আর একজন হইলেন মহাত্মা গান্ধী,

অহিংস অসহযোগ-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক এবং ভারতের নব-স্বাধীনতার প্রধানতম নায়ক।

এই দুই মহাপুরুষের রাজনৈতিক লক্ষ্য এক, শুধু নিজের দেশের নয়, শুধু এক শ্রেণীর লোকের নয়, জগতের সমস্ত দেশের, সমস্ত শ্রেণীর বঞ্চিত মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হইল এই দুই মহাপুরুষেরই লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্য, এই দুই অতি-মানব দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। একজন সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করেন, আর একজন সম্পূর্ণ অহিংস নীতিতে সংগ্রাম পরিচালনা করেন।

কিন্তু তাঁহাদের দুইজনের জীবনধারার বিকাশ লক্ষ্য করিলে, একটি বিস্ময়কর সামঞ্জস্য দেখা যায়।

লেনিন যখন রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনে আবির্ভূত হইলেন, তিনি হঠাৎ কোন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিলেন না। তিনি স্থিরভাবে পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেন বারবার সকল আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বে সহস্র সহস্র যুবক রাশিয়ার জন্য অকুণ্ঠভাবে আত্মদান করিয়াছে, সাইবেরিয়ার নির্ব্বাসনে, ফাঁসির মঞ্চে সহস্র সহস্র ফুলের মত যুবকের জীবন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জার-তন্ত্রকে তাহারা বিশেষ কিছুই দুর্ব্বল করিতে পারে নাই। তাই লেনিন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, বিচার করিয়া দেখিতে লাগিলেন, পূর্ব্ব-পন্থার মধ্যে কোথায় ত্রুটি। সেই ত্রুটির সন্ধান না পাইলে, অন্ধভাবে অগ্রসর হইলে, তাঁহাকেও হয়ত এমনি জীবনদান করিয়াই চলিয়া যাইতে হইবে,—সমস্ত আয়োজন, সমস্ত ত্যাগ, এতখানি কষ্টস্বীকার, সবই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

তাই তিনি গবেষণা করিয়া দেখিলেন, ব্যক্তিগত গুপ্তহত্যার পথ ভুল পথ। সে-পথে কখনও একটা রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন আনা সম্ভব নয়।

জনগণের সম্মিলিত সাহায্য ব্যতিরেকে কোনও গণ-অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। সুতরাং প্রথমে সেই গণ-চেতনাকে একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে জাগাইতে হইবে, সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রয়োজন প্রচারের, রাজনৈতিক শিক্ষার। রাশিয়ার ভিতর হইতে তাহা করা সম্ভব নয়। কারণ গুপ্তচরেরা সন্ধান পাইলেই সমস্ত কেন্দ্র ভাঙ্গিয়া দিবে। এই ভাবে পূর্ব্বে যে-সব কেন্দ্র হইয়াছে, তাহারা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সুতরাং ইহার কেন্দ্র দেশের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, জারের গুপ্তচরের নাগালের বাহিরে। এই ভাবে লেনিন গবেষণা এবং বহু চিন্তা করিয়া আগামী আন্দোলনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়া অগ্রসর হন।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের দিকে চাহিয়া আমরা ঠিক এই একই সুচিন্তিত কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা দেখি। সেইজন্যই তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলন পূর্ব্বেকার সমস্ত আন্দোলন হইতে স্বতন্ত্র। এবং এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই আজ তাহা এত কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। বহু চিন্তা, বহু গবেষণার পরই তিনি অসহযোগ-আন্দোলনের সমস্ত ধারা-উপধারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লন এবং একবার যাহা স্থির সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছেন, সর্ব্ব-অন্তর দিয়া তাহাকে মানিয়া চলাই হইল তাঁহার রাজনীতি। লেনিনের মত তিনিও বুঝিয়াছিলেন, ব্যক্তিগত গুপ্তহত্যার দ্বারা বৃটিশ-শক্তির মত একটা পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাহাকে ভুল পন্থা বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজ-সরকার ভারতবর্ষকে যেভাবে নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই অনুপাতে তাহারা যতখানি সশস্ত্র, সেক্ষেত্রে ভারত-বর্ষের ভিতরে কোন সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা রাজনৈতিক মুক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব নয়। এই অতিকঠোর সত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াই, তাঁহাকে অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিতে হয়। তাহা ছাড়া,

যেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের নিকট এটম্ বম্-জাতীয় অস্ত্র থাকা সম্ভব, সেক্ষেত্রে দুর্ব্বল জাতি কখনও রিভলভার বা তরবারি লইয়া বেশীদূর কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সেইজন্য তিনি সম্পূর্ণ নূতন একটা সংগ্রাম-নীতি আবিষ্কার করিলেন। জগতের ইতিহাসে তাঁহার এই নূতন সংগ্রাম-নীতি একটি অভিনব দান।

তিনি বুঝিয়াছিলেন, বহুদিনের দুর্ব্বলতা এবং পরবশতার ফলে, আমাদের দেহ যে শুধু দুর্ব্বল হইয়াছে তাহা নয়, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে আমাদের মন। যাহার মন দুর্ব্বল, যাহার মনের সব শক্তি চলিয়া গিয়াছে, তাহার দেহ যতই সবল হউক, তাহার হাতে যতই অস্ত্র থাকুক, তাহা নিরর্থক। দুর্ব্বল যাহার মন, অস্ত্র হাতে পাইলেও সে তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। তাই, ভারতবাসীর সেই ভয়কণ্টকিত দুর্ব্বল মনকে বজ্রকঠিন এবং ভয়হীন করিবার জন্য তিনি সত্যাগ্রহের পন্থা অবলম্বন করিলেন। যাহার মন ভয়হীন, জগতের কোন শক্তি তাহাকে পদতলে রাখিতে পারে না। সত্যাগ্রহ-সাধনা সেই শক্তি আনিয়া দেয় মনে। তাই এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার নেতৃত্বে ভারতবর্ষ আজ জগৎ-সভায় তাহার সম্মানের আসন অধিকার করিয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর পিতামহ উতা গান্ধী অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। তিনি পোরবন্দর-রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। পরে জুনাগড়ের নবাবের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা করমচাঁদ গান্ধী রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের প্রধান সচিব ছিলেন। তাঁহার জননী একান্ত ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। পূজা-অর্চ্চনা, দেবসেবা এবং ব্রত-উপবাসে তাঁহার পুণ্যজীবন অতিবাহিত হয়।

বালক-কালে স্কুলে তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু তিনি একান্ত লাজুক ছিলেন। স্কুলে কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা

বলিতে পারিতেন না। পাছে ছেলেরা কলহ করে বা কোন কটু কথা বলে, সেইজন্য ছুটি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একরকম ছুটিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতেন।

ছাত্রাবস্থায় একবার একখানি নাটক তাঁহার হাতে আসে। সেই নাটকখানি রাজা হরিশ্চন্দ্রের জীবন লইয়া রচিত। সেই নাটক পড়িয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যপালনের উদাহরণ দেখিয়া, সেই বালক-কালেই তাঁহার মনে সত্য-পালনের জন্য এক দৃঢ় বাসনা জাগিয়া উঠে। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হইয়া উঠেন। তাঁহার মত জীবনের সব কাজে সত্যকে পালন করাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, বালক-কাল হইতেই এই মহাসত্য তাঁহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায় এবং আজও পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইল সত্য। সেইজন্য তিনি যে আত্মচরিত রচনা করেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন, সত্যের সহিত জীবন-পরীক্ষা।

আর একটি পৌরাণিক চরিত্র বালক-কালে তাঁহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা হইল প্রহ্লাদ। এই দুইটি প্রভাব তাঁহার জীবনে চিরস্থায়ী হইয়া যায়।

তিনি ছেলেবেলা হইতে একান্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মিথ্যাকথা বলাকে তিনি মনেপ্রাণে ভয় করিতেন। সামান্য কারণে যদি কোন মিথ্যাকথা বলিয়া ফেলিতেন, তাঁহার অনুশোচনার অন্ত থাকিত না।

উচ্চশিক্ষালাভের জন্য যখন বিলাত গমন করেন, তখন মার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া যান যে, বিলাতে মদ্য ও মাংস স্পর্শ করিবেন না। কিন্তু বিলাতে গিয়া দেখিলেন, সেই শীতের দেশে মদ্য বা মাংস না খাইলে মানুষ থাকিতে পারে না। একদিন এক সম্ভ্রান্ত সভায় সকলে টেবিলে যখন খাইতে বসিয়াছেন, তখন বিলাতী প্রথা-অনুযায়ী ভৃত্য মদ্য পরিবেশন করিয়া গেল। সহসা গান্ধীজীর স্মরণ হইল, মাতার নিকট যে শপথ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার কথা। মনের মধ্যে তীব্র

দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া গেল। বিলাতী ভব্যতার রীতি-অনুযায়ী টেবিল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপায় নাই। অথচ টেবিলে বসিয়া থাকিতে তাঁহার মনে তীব্র অনুশোচনার উদয় হইতেছে। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হইয়া গান্ধীজী সকলকে বিস্মিত করিয়া টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন এব আদালতে যোগদান করিলেন। কিন্তু অচিরকালের মধ্যেই বুঝিলেন, ব্যারিষ্টারী পাশ করা সহজ হইতে পারে কিন্তু ব্যারিষ্টার হওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ নয়। কারণ স্বভাবতঃই তিনি একান্ত লাজুক ছিলেন। তাহা ছাড়া, অন্তর হইতে তিনি অন্যায়কে ঘৃণা করিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যারিষ্টারকে জানিয়া শুনিয়া অর্থের জন্য অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতে হয়। নিজের অন্তরের সঙ্গে এই ভাবে প্রতারণা করিতে তাঁহার অন্তরে গিয়া লাগিল। সেইজন্য কোন মামলাই তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বহুদিন পরে একটা মামলা তাঁহার হাতে আসিল। সেই তাঁহার ব্যারিষ্টার-জীবনে প্রথম-মামলা। মামলার ভার গ্রহণ করিবার সময়, হঠাৎ দালাল আসিয়া কমিশন চাহিল। গান্ধীজী বাঁকিয়া বসিলেন, দালালকে তিনি কেন কমিশন দিবেন? তাঁহাকে সকলে মিলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল, আদালতের ইহাই রীতি। সকল আইনজীবীই ইহা দিয়া থাকেন। কিন্তু গান্ধীজী কিছুতেই রাজী হইলেন না। বলিলেন, সেক্ষেত্রে বরঞ্চ তিনি মামলার ভারই গ্রহণ করিবেন না।

অগত্যা তাঁহার জিদই বজায় রহিল। মামলার দিন বিচারকের সামনে সাক্ষীকে সওয়াল-জবাব করিতে উঠিয়া, গান্ধীজীর মুখে আর কোন কথা বাহির হয় না। দর দর করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতে থাকে। চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত ঝাপসা হইয়া আসে। তিনি আদালত হইতে বাহির হইয়া তাঁহার মক্কেলকে জানাইলেন, আমি টাকা ফেরত দিতেছি, আপনি অন্য উকীল দেখুন।

এমনি ভীরু এবং সংশয়শীল যিনি ছিলেন, আজ যে-কোন অবস্থায়, য-কোন সময়ে এবং স্থানে, যে-কোন লোক বা জনতার সম্মুখে তাঁহার মুখের অনায়াস-উচ্চারিত বাণী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সুষমায় সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া দেয়। সেদিন নিজের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে তিনি নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়েন এবং সেইদিন হইতে এই দুর্ব্বলতা দুর করিবার জন্য নিষ্ঠা-সহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তিনি কোন মামলাই আর গ্রহণ করিলেন না।

ইহার কয়েক মাস পরে সহসা দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাইবার তাঁহার এক সুযোগ উপস্থিত হইল। সেই সময় দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবর্ষ হইতে বহু শ্রমিক এবং বহু ব্যবসায়ী যাইয়া বসবাস করিতেছিল। দাদা আবদুল্লাহ্ নামক এক ব্যক্তি সেখানে বিরাট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। তিনি তাঁহার ব্যবসায়-সংক্রান্ত এক মামলার জন্য গান্ধীজীকে ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকায় আনয়ন করিলেন। এবং স্থায়িভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠানে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। এই ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভাগ্য তাঁহাকে তাঁহার ভবিতব্যের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছিল।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় এই সময় শতসহস্র ভারতবাসী আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু ইংরাজ-ঔপনিবেশিকগণ তাহাদিগকে কুকুরের অধম জ্ঞানে ঘৃণা করিত। ইংরাজদিগের সহিত এক ফুটপাথে হাঁটিবার তাহাদের অধিকার ছিল না। যে হোটেলে ইংরাজরা যাইত, সে হোটেলে কালা-আদমীদের ঢুকিতে দেওয়া হইত না। পার্কে, রঙ্গালয়ে বড় বড় অক্ষরে সাইনবোর্ডে লেখা থাকিত, কুকুর এবং কালা-ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ। কেহ যদি কোন প্রকারে এই ইংরাজ-স্বাতন্ত্র্যের বেড়ার মধ্যে গিয়া পড়িত, তাহা হইলে লাথি হইতে আরম্ভ করিয়া রিভলভারের গুলি পর্য্যন্ত তাহাকে গ্রহণ করিতে হইত।

ব্যারিষ্টারী করিতে আসিয়া মানবতার এই ভয়াবহ লাঞ্ছনা চোখের সামনে দেখিয়া, তাঁহার অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, ব্যক্তিগত দিক হইতে এ অপমান তিনি সহ্য করিবেন না। কিন্তু তাহার জন্য অচিরেই অসীম লাঞ্ছনা তাঁহাকে ভুগিতে হইল।

একদিন একটি গাড়ী ভাড়া করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছেন। এমন সময় একজন শ্বেতাঙ্গ আসিয়া চালককে আদেশ করিল, আরোহীকে নামাইয়া দিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে। চালক তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া গান্ধীজীকে নামিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু গান্ধীজী এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই বলিষ্ঠদেহ শ্বেতাঙ্গ ঘুষির পর ঘুষি মারিয়া গান্ধীজীকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

কোন কোন রাস্তার ফুটপাতের উপর দিয়া কালা-আদমীদের হাঁটিবার আদেশ ছিল না। গান্ধী সেই অন্যায় আদেশ অস্বীকার করিয়া ফুটপাথ দিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। ফলে, প্রতিদিনই শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইতে লাগিল। একদিন ফুটবলের মত লাথি মারিতে মারিতে তাহারা রাস্তার এদিক হইতে ওদিকে তাঁহাকে ফেলিয়া দল।

এই ভাবে নির্য্যাতন ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে এক তীব্র প্রতিরোধ-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছিল। তিনি স্থির করিলেন, একা একা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বিশেষ কোন ফললাভ হইবে না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকলকে দাঁড়াইতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে দাদা আবদুল্লাহ্-র গৃহে তিনি নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের জন্মদান করিলেন। যে বিরাট্ আন্দোলনে একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাহার জন্ম এইদিনই

সুদূর দক্ষিণ-আফ্রিকায় হয়। সেদিন ভারতবর্ষে ইহার সংবাদ পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটি অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সেখানকার ভারতবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিলেন। যে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন আজ জগতের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সেদিন দক্ষিণ-আফ্রিকার ডারবিন শহরে তাহার প্রথম উৎপত্তি হয়। এই আন্দোলন চালাইবার উপযুক্ত যোদ্ধা প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি ফিনিক্স শহরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত প্রথম সত্যাগ্রহ-আশ্রম। এই আশ্রমের অধিবাসীদিগকে তিনি অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করিয়া সত্যকে আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রের শত নির্য্যাতনের মধ্যে তাহাদের প্রস্তুত করেন। এই আন্দোলন পরিচালনা করিবার সময় গান্ধীজী শ্বেতাঙ্গ-অফিসরদের হাতে যে দৈহিক নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। একবার তিনি এমন ভীষণভাবে প্রহৃত হন যে তাঁহার জীবনের সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু সুস্থ হইয়াই তিনি পুনরায় সেই নির্য্যাতন গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাধারণ লোকেরও ভয় দূরীভূত হইয়া গেল। নৈতিক মহত্বের একটা বিপুল সংক্রামক শক্তি আছে। গান্ধীজীর সেই অবিচলিত সাহস দেখিয়া একান্ত ভীরু লোকের মনেও কোথা হইতে বিরাট পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া গেল। দলে দলে লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল।

এই আন্দোলনে সত্যাগ্রহীরা দলে দলে কারাগার বরণ করিতে লাগিল। এই আন্দোলনে তাঁহার সহধর্ম্মিণী কস্তুরবাঈও যোগদান করেন এবং অন্য সকলের মত তিনিও তিন মাস কারারুদ্ধ হন। যখন আন্দোলন ব্যাপক হইয়া উঠিল তখন দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার

গান্ধীজীকে কারারুদ্ধ করিলেন। বিচারে তাঁহার তিন বৎসর কারাদণ্ড হইল। এই তাঁহার জীবনে প্রথম কারাবাস।

তিন বৎসর কারাবাসের পর গান্ধীজী যখন মুক্ত হইলেন, তখনও পর্য্যন্ত দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকারের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। গান্ধীজী বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকট বহু আবেদন করিলেন কিন্তু কোন সুফলই ফলিল না। তখন তিনি দ্বিগুণ উদ্যমে পুনরায় সত্যাগ্রহ-আন্দোলন শুরু করিলেন। নির্য্যাতনের মাত্রার সঙ্গে সত্যাগ্রহীদের উদ্যমের যেন পাল্লা চলিতে লাগিল। এতদিনে দক্ষিণ-আফ্রিকার বাহিরে জগতের দৃষ্টি এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এই আন্দোলনের নূতনত্বে অনেকে বিস্মিত হইয়া গেল। আন্দোলনের লক্ষ্যের অপেক্ষা আন্দোলনের প্রকৃতির দিকেই লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে পতিত হইল। এ-যাবৎ কাল মানুষ আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাতই করিয়া আসিয়াছে, অন্ততঃ তাহারই আয়োজন করিয়াছে কিন্তু এই শীর্ণকলেবর লোকটি সমস্ত আঘাত হাসিমুখে সহ্য করিয়া চলিয়াছে, আহত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে তথাপি প্রতি-আঘাত করিতে একটি অঙ্গুলীও উত্তোলন করিবে না। অস্ত্রের সম্মুখে অকুণ্ঠভাবে বক্ষ পাতিয়া দিবে। এই নূতন ধরণের বীরত্বে সকলে মুগ্ধ না হইয়া পারিল না। গান্ধীজীর জগৎচিত্ত-জয়ের অভিযান এই ভাবে শুরু হইল।

দক্ষিণ-আফ্রিকা-সরকার পুনরায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু তাহাতে আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠিল। দলে দলে লোক তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। একজন নায়ক কারারুদ্ধ হন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্থানে আর একজন নায়কত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। এই ভাবে অবিচ্ছেদ ধারায় সত্যাগ্রহ-আন্দোলন অগ্রসর হইয়া চলিল। অগত্যা দক্ষিণ-আফ্রিকা-সরকারকে তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইল। অপমানজনক বিধি-নিষেধ তাঁহারা প্রত্যাহার করিয়া

লইলেন। গান্ধীজী কারামুক্ত হইলেন। এই আন্দোলনের ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা নয়, ইহার ফলে গান্ধীজী জগতের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা নূতন অভিব্যক্তির পরিচয় পাইলেন। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উপলব্ধি করিলেন, রাজনীতির জগতে সত্য-ধর্ম্মের একটা বিশেষ স্থান আছে।

গান্ধীজীর বিরাট কর্ম্মময় জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার জীবনের প্রতিটি দিন কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ। যাহাতে দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি জগৎ-কল্যাণে এই ভাবে কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে পারেন, সেইজন্য তিনি তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একান্ত সজাগ। তাঁহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত একটি অপরূপ নিয়মের সুষমায় মণ্ডিত। সেইজন্য তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তিনি শতবর্ষেরও অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন।

তাঁহার সেই সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের সমস্ত ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন কারাগারে গমন করেন, সেই সময় আদালতে তাঁহার নিজের জীবন সম্পর্কে তিনি একটা বিবৃতি দান করেন। সেই বিবৃতি হইতে, তাঁহার প্রথম জীবনের মূল ঘটনাগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

"১৮৯৩ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমার রাজনীতিক জীবন আরম্ভ হয়। * * সেখানকার বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের অভিজ্ঞতা মধুময় নয়। তখনই আমি প্রথম আবিষ্কার করি যে ভারতীয় হিসাবে এবং সাধারণ মানুষ হিসাবে আমাদের প্রাপ্য অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত। কিন্তু সেই রূঢ় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, বৃটিশ চরিত্রের ন্যায়নিষ্ঠা সম্পর্কে তখনও আমি বিশ্বাস হারাই নাই। তখন মনে করিয়াছিলাম যে, উহা আকস্মিক। সেইজন্য বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে তখন বিমুখ হই নাই।

"১৮৯৯ সালে বুয়ার যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত নড়িয়া

ওঠে। সেই যুদ্ধে আমি স্বেচ্ছায় যোগদান করি এবং নিজে একটি স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়িয়া তুলি। লেডিস্মিথ শহরের যুদ্ধে সেই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী লইয়া আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করি। এই কার্য্যের জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ আমাকে কাইসার-ই-হিন্দ্ সুবর্ণপদক দিয়া পুরস্কৃত করেন।

"তারপর ১৯১৪ সালে যখন বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখনও বৃটিশের সহায়তায় আমি লণ্ডনের ছাত্রদের লইয়া এম্বুলেন্স কোর গঠন করি। এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশের সহায়তার জন্য ভারতীয় সেনাদল গঠনে সাহায্য করি কিন্তু রাউলাট বিল পাশ হওয়াতে আমার জীবনে প্রথম আঘাত লাগিল। তারপর আসিল, পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ার-ও ডায়ারের অনাচার। বৃটিশ ন্যায়-নিষ্ঠায় আমার সমস্ত বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়া গেল।"

সেই দিন হইতে গান্ধীজীর জীবনে এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের জীবনেও এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ার-ও ডায়ার নিরীহ জনতার উপর যে পাশবিক অত্যাচার করিয়া গেল, সেই মৃত্যু-অধিক অপমান জাতির ভীরু চেতনাকে তীব্র কশাঘাতে জাগাইয়া তুলিল। সমগ্র দেশ তখন বিধি-নিষেধের তীব্র বন্ধনে মূক। সেই মূকত্বকে অস্বীকার করিয়া ভারতের কবি বজ্র-বাণীতে মানবতার সেই রূঢ় অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিবার জন্য ভারতবাসীর অন্তরে বাণীর দাবানল জ্বালাইয়া তুলিলেন। মহাত্মা গান্ধী জাতির সম্মুখে নূতন সংগ্রামের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন। যতদিন না ইংরাজ তাহার ভুল স্বীকার করে এবং ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দেয়, ততদিন ভারতবর্ষ ইংরাজের সহিত সর্ব্ব-কার্য্যে অসহযোগ করিবে। এবং এই অসহযোগ-আন্দোলন কি ভাবে, কোন্ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইবে, তাহা জাতির সম্মুখে স্পষ্ট

ভাষায় তুলিয়া ধরিলেন। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষ নড়িয়া উঠিল। দলে দলে লোক ইংরাজের রোষ-ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করিয়া, পুলিশের শত নির্য্যাতনের ব্যথা সগৌরবে বহন করিয়া কারাগারের দিকে যাত্রা করিল। কারাগার হইয়া উঠিল তীর্থ, জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে গান্ধীজী কারারুদ্ধ হইলেন।

ইহার পর হইতে তাঁহার জীবন কারাগারকে কেন্দ্র করিয়া যেন আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এক একবার কারাগার হইতে বাহির হন, নূতন কর্ম্ম-প্রেরণায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন, আবার কারাগারে গিয়া বিশ্রাম লাভ করেন। তাঁহার এক একবার কারাগমনের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক ক্রমোন্নতির এক একটি স্তর বিজড়িত। দেশবাসী অনেকে প্রথম প্রথম এই অহিংস আন্দোলনের সার্থকতা সম্বন্ধে মনে মনে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন। এমন কি, ইংরাজী সংবাদপত্রের চালকেরা ইহা বাতুলের কাণ্ড মনে করিয়া উপহাসও করে। যখন মহাত্মাজী লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য উনআশি জন অনুচরসহ ডাণ্ডীর উপকূল অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন তাঁহাকে কোন প্রকার বাধা দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করে নাই গভর্ণমেণ্ট। সামান্য লবণ, এক পয়সা দিয়া যাহা বাজারে দরিদ্রতম লোকেরাও কিনিয়া ব্যবহার করে, তাহা সমুদ্রের জল হইতে সরকারী আইন ভঙ্গ করিয়া প্রস্তুত করার মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কি যোগ থাকিতে পারে, তাহা তখন কেহই অনুমান করিতে পারে নাই। সকলেই মনে মনে বাতুলের খেয়াল বলিয়া এই ঘটনাকে লঘু-উপহাসে গ্রহণ করে। মহাত্মা গান্ধী সেই দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটিয়া ডাণ্ডীর সমুদ্র-উপকূলে উপস্থিত হইলেন। স্বহস্তে সমুদ্রের জল হইতে জ্বাল দিয়া নিজের ব্যবহারের লবণ প্রস্তুত করিলেন এবং প্রত্যেক সত্যাগ্রহীকে এই ভাবে লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার আদেশ দিলেন।

সারাদেশের মধ্য হইতে নিরস্ত্র নিরীহ সত্যাগ্রহীর দল লবণাম্বুর দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমশঃ দেশবাসী সকলে এবং সেই সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট বুঝিল, এই সামান্য ব্যাপারের পিছনে কি বিরাট সার্থকতা লুকাইয়া ছিল। এইখানেই গান্ধীজীর রাজনীতির চরম বৈশিষ্ট্য। কোন্ ঘটনার মধ্য দিয়া জাতির আত্মিক শক্তির রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করা যায়, ঐন্দ্রজালিকের মত তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। যাহাকে সামান্য, আপাততুচ্ছ, নিতান্ত নিরীহ বলিয়া মনে হয়, কিছুদিন যাইতে না যাইতে দেখা যায়, কোথা হইতে তাহারই মধ্যে প্রকট হইয়া ওঠে বিরাট শক্তি, বিপুল আবেগ, তীব্রতম বিপ্লব-প্রেরণা।

এতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত আন্দোলন মূলতঃ শহরের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাই বারবার সমস্ত আয়োজন শহরের চৌহদ্দীর মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল। শহরের বাহিরে ভারতবর্ষের অগণন গ্রামে যেখানে অধিকাংশ ভারতবাসী বাস করে, সেখানে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের এই অত্যাচারী রূপ গিয়া পৌছায় না। শহরের আন্দোলনের পিছনে গ্রামবাসী বিরাট জনতার কোন কার্য্যকরী যোগ না থাকার দরুণ, বারবার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তাই মহাত্মাজী স্থির করিলেন, এই আন্দোলনকে শহর হইতে গ্রামের অভ্যন্তরে লইয়া যাইতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের নৃশংস অত্যাচারী রূপকে গ্রামবাসীদের চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের মনে শাসক-সম্প্রদায়ের বাহনদের সম্বন্ধে যে ভয়াবহ আতঙ্ক আছে, তাহা দূরীভূত করিতে হইবে। এই তিনটি বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অপূর্ব্ব রাজনৈতিক প্রতিভার দানস্বরূপ তিনি লবণ-সত্যাগ্রহের প্রবর্ত্তন করেন।

অচিরকালের মধ্যে তাঁহার পরিকল্পনা-অনুযায়ী লবণ-সত্যাগ্রহ সমগ্র ভারতবর্ষের অন্তরতম স্থলে অহিংস বিপ্লবের বাণীকে পৌছাইয়া দিল।

সত্যাগ্রহীর হাতের মুঠো হইতে লবণ কাড়িয়া লইবার জন্য পুলিশের লাঠির পর লাঠি ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু তবুও সত্যাগ্রহীর পণ ভঙ্গ হইল না। এই এক আন্দোলনের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের চূড়ান্ত লগ্নে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূতের ভয়ের মতন যে শাসন-দণ্ডের ভয়, সরকারী লাল-পাগড়ী আর খাকি-পোষাককে আশ্রয় করিয়া ছিল, এই অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক যেন যাদুমন্ত্রে তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলেন। ইংরাজ-সংবাদিকেরা লবণ-সত্যাগ্রহকে উপহাস করিতে ভুলিয়া গেল। তাহারা মহাত্মা গান্ধীকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে বারবার উত্যক্ত করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্টও আবার তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশের মধ্যে যে নির্য্যাতন আর নিষ্পেষণ শুরু হইল, তাহার প্রতিক্রিয়ায় নিস্তেজ গণ-চেতনা সংগ্রামমুখী হইয়া উঠিল। বৃটিশ পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিল। কংগ্রেসের সহিত আপোষ-মীমাংসার জন্য লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন হইল এবং মহাত্মা গান্ধী সেই গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন।

মহাত্মাজীকে কারাগার হইতে মুক্ত করা হইল এবং তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিলেন। ইংলণ্ডের সেই নিদারুণ শীতে একবস্ত্র সেই অর্দ্ধ-নগ্ন ফকীরকে দেখিয়া ইংলণ্ডবাসীরা বিস্মিত হইয়া গেলেন। কিন্তু এই বৈঠকের আলোচনার ফলে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিমন্ত্রিত হইয়া পদার্পণ করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনরায় কারারুদ্ধ করিলেন।

হিন্দু-সমাজ হইতে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পৃথক্ করিবার জন্য এবং

হিন্দু-শক্তির মধ্যে একটা স্থায়ী ভেদ আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অনুন্নত হিন্দু-সমাজের লোকদের জন্য পৃথক্ নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে। মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের সামাজিক জীবন হইতে এই অস্পৃশ্যতার কলঙ্ককে চিরকালের মত দূরীভূত করিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থা মহা-বিঘ্নের মত তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কারাগারের মধ্য হইতেই এই অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য তিনি স্বকীয় একটা পন্থা অবলম্বন করিলেন, অনশন। তিনি শপথ গ্রহণ করিলেন, যতক্ষণ না বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই অন্যায় আইন তুলিয়া লয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি অনশন করিয়া থাকিবেন, প্রয়োজন হইলে তিনি অনশনে দেহত্যাগ করিবেন।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর কারাগারের মধ্যে এই অনশন-ব্রত ভারতের আত্মিক শক্তির একটা জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ রহিয়া গিয়াছে। জগৎ-আতঙ্ককারী মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্ষীণদেহ নিরস্ত্র এই একটি লোককে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিল না। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের আত্মিক শক্তির সঙ্গে বস্তু-শক্তির এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব জগৎ নির্নিমেষ-বিস্ময়ে অবলোকন করিতে লাগিল। সমগ্র জগতের দৃষ্টি যারবাদা জেলের দিকে আকৃষ্ট হইল। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়, অথচ মহাত্মা সঙ্কল্পে অটল। ক্রমশঃ দেহ অবশ হইয়া আসিল। বাক্‌শক্তি চলিয়া গেল। মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিল। তবুও তপস্বীর মুখে বিরক্তির রেখা নাই। মহামৌনীর মত নিজের অন্তরের ঐশ্বর্য্যে তখনও তিনি সঙ্কল্পকে আঁকড়াইয়া আছেন। ডাক্তারেরা তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ঘোষণা করিলেন, জীবনের আশা ক্ষীণতম হইয়া আসিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে, সমগ্র জগৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। একটি নিরস্ত্র নিরীহ মানুষ যে এই ভাবে সমগ্র জগতের চেতনাকে দোলা দিতে

পারে, তাহা জগতের ইতিহাসে এই একবারই দেখা গেল। ভীত আতঙ্কিত হইয়া ভারতের প্রত্যেক খ্যাতনামা নায়ক সেই মৃত্যুপণ-কারীর শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কম্পিত-হৃদয়ে বিশ্বকবি তাঁহার অন্তরের প্রিয়-বান্ধব ও শিষ্যের পার্শ্বে ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই ম্লান মৌনতায় অপেক্ষা করিয়া আছেন, কখন আসে শেষ-লগ্ন। অবশেষে বৃটিশ আমলা-তন্ত্রের লৌহ-দেহের অভ্যন্তরে পাষাণ-অন্তর নড়িয়া উঠিল। সেই আইন প্রত্যাহারের সংবাদ লইয়া জেলের প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। ভারতের সেই তপস্বীর আত্মিক জয়ে দুরতম পল্লীর অন্তর পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিল। জগৎ নিঃসংশয়ে বুঝিল, বিংশ শতাব্দীর জটিল জগতে এক নূতন শক্তির জন্ম হইয়াছে। শত্রু, মিত্র সকলে সেই মহাশক্তির কাছে মাথা নত করিল।

এই ঐতিহাসিক ব্রত-ভঙ্গের দিনে কারাগারের ভিতরে শয্যাশায়ী এই আশ্চর্য্য লোকটিকে ঘিরিয়া সেদিন ভারতবর্ষের অধিকাংশ নায়কই উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের অপরূপ ভঙ্গীতে এই ঘটনাকে বিবৃত করিয়া একটি রচনা প্রকাশ করেন। তাহার উপসংহারে তিনি লিখিতেছেন, "তারপর মহাত্মাজী শ্রীমতী কস্তুরবাঈএর হাত হতে ধীরে ধীরে লেবুর রস পান করলেন। পরিশেষে সবরমতী আশ্রমবাসিগণ এবং সমবেত সকলে 'বৈষ্ণব জন কো' গানটি গাইলেন। ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ হলো...সকলে গ্রহণ করলেন। জেলের অবরোধের ভেতর মহোৎসব! এমন ব্যাপার আর কখনো ঘটেনি। প্রাণোৎ-সর্গের যজ্ঞ হলো জেলখানায়, তার সফলতা এইখানেই বিগ্রহ ধারণ করলো। মিলনের এই অকস্মাৎ আবির্ভূত মূর্ত্তি, একে বলতে পারি যজ্ঞসম্ভবা!"

এই ঘটনার পর মহাত্মাজীর জীবনের প্রধান ঘটনা হইল, কংগ্রেসের

সহিত নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একান্তভাবে হরিজন-উন্নয়নের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করা। তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যপদ হইতেও সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কংগ্রেস তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল না। তিনি কংগ্রেসের পরামর্শদাতা-রূপে রহিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দেশের মধ্যে যে-সব তরুণ নায়ক জনতার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া ভারতের ভাগ্য-পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছার দ্বারা কংগ্রেসকে প্রভাবান্বিত করিতে তাঁহার নৈতিক বোধে আঘাত লাগিল। তাই তাঁহার শিষ্যদের উপরে সংগ্রাম-পরিচালনার সাক্ষাৎ ভার সমর্পণ করিয়া তিনি জাতির আভ্যন্তরিক কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। যাঁহাদের উপর বিশ্বাস করিয়া তিনি এই ভার সমর্পণ করিলেন, তাঁহারাও তাঁহার যোগ্য প্রতিনিধির ন্যায় জাতির বিজয়-রথকে আগাইয়া লইয়া চলিলেন। ক্রমশঃ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট নূতন আইন করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করিল। কংগ্রেস অসহযোগ-নীতি ত্যাগ করিয়া দেশের শাসন-ভার গ্রহণ করিল। ভারতবর্ষের সাতটি প্রধান প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং তাঁহারা ধীরে ধীরে গঠনমূলক কার্য্যের মধ্য দিয়া দুর্ব্বল জাতিকে আগাইয়া লইয়া চলিলেন।

এই সময় জগতে পুনরায় হিংসার সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বিশ্বগ্রাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জগতের প্রত্যেক জাতিকে রণক্ষেত্রে টানিয়া আনিল। কংগ্রেসের সম্মুখে মহাসমস্যা উপস্থিত হইল, এই যুদ্ধে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য কি?

জাতির এই সঙ্কট-কালে কংগ্রেসের নেতারা পুনরায় মহাত্মাজীর শরণাপন্ন হইলেন। এবং তিনিও জাতির প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া সেই সঙ্কট-লগ্নে পুনরায় স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনার সাক্ষাৎ ভার গ্রহণ

করিলেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাহাদের সামরিক উদ্দেশ্য ঘোষণা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। যদি জগতের গণতন্ত্র-ব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজ এই সংগ্রামে নাৎসী জার্ম্মাণী এবং জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে ইংরাজকে ঘোষণা করিতে হইবে যে, এই যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষও তাহার ন্যায্য স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবে। কিন্তু চার্চ্চিল-পরিচালিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর এই প্রস্তাবকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলিয়া ঘোষণা করিল। তখন মহাত্মা গান্ধী শেষ সংগ্রামের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিলেন এবং মাত্র দু'টি কথায় প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরের বাসনাকে রূপ দিলেন। সে দু'টি কথা হইল, "কুইট্ ইণ্ডিয়া"।

ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট কালবিলম্ব না করিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত কংগ্রেসের প্রত্যেক বিশিষ্ট কর্ম্মী ও নেতাকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিনা-বিচারে কারারুদ্ধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশময় বিদ্রোহের লেলিহান শিখা মেঘস্পর্শী হইয়া উঠিল। এতদিনের সঞ্চিত প্রতিহিংসা-বাসনা অহিংস-নীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া রক্তাক্ত হিংস্রমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল। কেহ জানিল না কি ভাবে কি হইল, কোথা হইতে সাধারণ মানুষের মধ্য হইতেই নেতাহীন দেশে নেতা আপনা হইতে দেখা দিল। স্থানে স্থানে তাহারা সরকারী কর্ম্মচারীদের হত্যা করিয়া স্থানীয় স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিল। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টও রুদ্র-মূর্ত্তিতে সেই বিপ্লব দমন করিতে লাগিল। আকাশ হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া গ্রামবাসীদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু বাঁধ ভাঙ্গিয়া যে গণ-চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আর রোধ করিতে পারিল না।

এমন সময় সহসা যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করা হইল এবং ইংলণ্ডে কন্‌সারভেটিভ দলের পরিবর্ত্তে লেবার পার্টির হাতে শাসনদণ্ড গিয়া পড়িল। ভারতবর্ষের এই ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তির কারণ দূরীভূত করিবার

জন্য লেবার গভর্ণমেণ্ট উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া সেই সময়, সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট গঠন এবং ইংরাজ ও আমেরিকান মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁহার সশস্ত্র অভিযানের কথা এতদিনের গোপনতার আবরণ ছিন্ন করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর চিত্তে এক নূতন আশার বাণী বহন করিয়া আনিল। সমগ্র দেশ বিপ্লব-সাধনার সঙ্কল্পে যেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। সেই সময় কংগ্রেসের সহিত নূতন করিয়া আলোচনার জন্য লেবার গভর্ণমেণ্ট একটি মিশন পাঠাইল। কারামুক্ত দেশ-নেতাদের সহিত দিনের পর দিন আলোচনা চলিতে লাগিল। কিন্তু কোনমতেই কোন মিলিত কর্ম্মপন্থা আবিষ্কৃত হইল না। মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওহরলাল সারাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ণ-স্বাধীনতার বাণীকে প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিলেন। ভারতের আকাশে-বাতাসে কুইট্ ইণ্ডিয়ার ধ্বনি অনুরণিত হইয়া উঠিল। অগত্যা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের দাবীকে স্বীকার করিয়া লইল এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব-সমেত লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে রাজপ্রতিনিধি-রূপে পাঠাইল। বারবার ইংরাজের প্রতিশ্রুতিতে ব্যর্থকাম ভারতবর্ষ লেবার গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থাকে সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিল। তখন দেশব্যাপী সেই সন্দেহের বিরুদ্ধে একা মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইংরাজের আন্তরিকতাকে বরণ করিয়া লইলেন। তাহার জন্য দেশবাসী তাঁহাকেও পর্য্যন্ত বিদ্রূপ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। কিন্তু মান-অপমানে, নিন্দা-প্রশংসায় সমান-চিত্ত এই মহাপুরুষ মেঘস্পর্শী ব্যক্তিত্বে সেদিন দেশব্যাপী সেই সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ধারাকে রোধ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কংগ্রেসের সন্ধি-ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তুলিলেন।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টে ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইল, এবং নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য ভারতবর্ষে কন্‌ষ্টিটিয়েণ্ট

এসেম্বলী গঠিত হইল। সিপাহী-বিদ্রোহে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, এতদিনে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল। ভারতবর্ষ নিজের রাষ্ট্রগঠনে পূর্ণ-অধিকার প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু ভারতবর্ষের চরম দুর্দ্দৈব, স্বাধীনতার এই চরম লগ্নে, এই বিরাট দেশ দু'টি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল, পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তান। মহাত্মা গান্ধী এই বিভাগকে স্বীকার করিয়া লইলেন, কারণ তাহা না করিলে অকারণ রক্তপাতে ভারতের মৃত্তিকা রক্ত-রঞ্জিত হইয়া উঠিত। এই বর্ব্বর রক্ত-মোক্ষণের অপরাধ হইতে যুগবাসীদের রক্ষা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী এই বিশ্বাসে এই বিভাগকে স্বীকার করিয়াছেন যে, একদা পরস্পরের মৈত্রী ব্যবহারে এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক একত্বের অনিবার্য্য আকর্ষণে, সাময়িক উত্তেজনার অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়া এই বিভক্ত দেশ পুনরায় একাঙ্গীভূত হইবে। প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য জগতের সভ্য নাগরিক-রূপে প্রত্যেকের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং প্রতিদিনের চিন্তায় এবং কার্য্যে নিখুঁত ব্যাবহারিকতা বজায় রাখিয়া চলা।

এই রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের বাহিরে মহাত্মা গান্ধী নিজের বিরাট একাকিত্বে একাই বিরাজ করিতেছেন। রাষ্ট্রের কোন পদ, কোন সম্মান তাঁহাকে আকর্ষণ করে না। যেদিন সমগ্র ভারত নব-লব্ধ স্বাধীনতায় আনন্দিত হইয়া উৎসব করিতেছিল, সেদিন যে-ব্যক্তি এই স্বাধীনতা-আনয়নের প্রধান কর্ত্তা, তিনি নোয়াখালার গ্রাম্য পথে চারিদিকের সন্দেহ আর হিংস্র কুটিলতার মধ্যে, নিঃশব্দে মানবতার কল্যাণে তাঁহার ব্রত পালন করিয়া চলিয়াছেন।

এই হিংসাকুটিল যুগে, শুধু ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র জগতের প্রয়োজন ছিল, এই অপরূপ ব্যক্তিটির, যিনি শতসহস্র ঝঞ্ঝার মধ্যেও মানবতার কল্যাণ-দীপকে অনির্ব্বাণ রাখিতে পারিয়াছেন।



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

উপাধি দুই প্রকারের। এক প্রকার হইল, যাহা গভর্ণমেণ্ট তাহার যোগ্য কর্ম্মচারীদের যোগ্যতার পুরস্কার-স্বরূপ দান করে। আর এক প্রকার হইল, যাহা জাতি স্বেচ্ছায় যাহাকে ভালবাসে তাহাকে দেয়। প্রথমোক্ত উপাধির একটা নির্দ্দিষ্ট তালিকা আছে, তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট স্তরভেদ আছে। যেমন রায় সাহেবের উপর রায় বাহাদুর, রায় বাহাদুরের উপর স্যার, ইত্যাদি। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত উপাধির কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই। জাতি কাহাকে কখন কি ভাবে ভালবাসিয়া কি ভাবে দেখিবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নে কেহ বলিতে পারে না। এইজাতীয় উপাধি জাতির অন্তর হইতে আপনিই বিকশিত হইয়া উঠে এবং ফুলের সুরভির মত সেই উপাধিধারীর নামের সঙ্গে স্বভাবতঃই জড়াইয়া যায়।

গত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বিদেশী বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যখন তাহার যোগ্য কর্ম্মচারীদিগকে উপাধি বিতরণ করিত, সেই সময় এই পরাধীন দেশের জনতা নিজেদের পরিমিত ক্ষমতার মধ্যে যাহাকে তাহাদের

আপনার জন বলিয়া জানিত, তাহাকে তাহাদের রিক্ততার মধ্য হইতে অন্তরের শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ এইজাতীয় উপাধি দিয়া ধন্য হইত। দেশবন্ধু হইল এইজাতীয় উপাধি এবং আজ এই উপাধি যারা শুধু একটি নামকেই বোঝায়, সে-নাম হইল চিত্তরঞ্জন দাশ। জাতির এই ভালবাসার চিহ্ন তাঁহার আসল নামকে ছাড়াইয়া জাতির অন্তরে অক্ষয় স্মৃতির মত বিরাজ করিতেছে। যতদিন এই পৃথিবীতে বাঙালী জাতি থাকিবে, ততদিন চিত্তরঞ্জন তাহার বন্ধু রূপে প্রত্যেক বাঙালীর অন্তরে বাস করিবেন। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, প্রত্যেক বাঙালীর বন্ধু-রূপেই বাঁচিয়া ছিলেন। যখন অকস্মাৎ এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, প্রত্যেক বাঙালী কাঁদিয়াছে, মনে করিয়াছে, তাহার প্রিয়তম আত্মীয়েরই বিয়োগ ঘটিল। তাঁহার পুণ্যশবদেহকে বহন করিয়া যে শোভাযাত্রা শ্মশান পর্য্যন্ত অনুগমন করে, জগতের ইতিহাসে তাহা বিরল বলিলে অত্যুক্তি ঘটে না। এতবড় সম্মান, জগতের খুব কম শাসক বা নেতার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তাহার কারণ তাঁহার চরিত্রের মধ্যেই ছিল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কলিকাতার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভুবনমোহন দাশ সেই সময়কার একজন বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় তিনি যে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তাহা নয়। পরন্তু তিনি প্রথমবার পরীক্ষায় ফেল্ করিয়া দ্বিতীয়বার ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা দিয়া তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যান। ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া তিনি যখন ভারতবর্ষে হাইকোর্টে যোগদান করেন, তখন তাঁহার অবস্থা এক প্রকার নিঃস্ব বলিলেই চলে। পিতা ভুবনমোহন খুব উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন। নিজে

ধার করিয়াও তিনি অপরের উপকার করিতেন। এই কারণে প্রভূত ঋণ রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করেন। তাই চিত্তরঞ্জন যখন তরুণ ব্যারিষ্টার-রূপে হাইকোর্টে যোগদান করিলেন, তখন তাঁহার মাথায় বিরাট সংসারের বোঝা এবং তাহার উপর তাঁহার পিতার এই বিরাট ঋণ। আদালতে কোন সহায়-সম্বল না থাকার দরুণ প্রথম প্রথম কোন মক্কেলই জুটিত না। ট্রামের পয়সা বাঁচাইবার জন্ত হাইকোর্ট হইতে ইডেন গার্ডেনের ভিতর দিয়া, গড়ের মাঠের মধ্য দিয়া গোপনে পায়ে হাঁটিয়া অনেকদিন তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে হইত।

ক্রমশঃ একটি দু'টি করিয়া মফঃস্বলের কেস্ হাতে আসিতে লাগিল। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেইসব মামলা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। আইনের মধ্যে তিনি ডুবিয়া গেলেন। অচিরকালের মধ্যেই অধ্যবসায়ের ফল ফলিতে লাগিল। একটু একটু করিয়া তাঁহার খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থবৃদ্ধিও ঘটিতে লাগিল।

এই সময় সহসা এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া গেল। সারাদেশের চিত্তকে আলোড়ন করিয়া বাঙালীর তারুণ্য তখন যুগান্তের মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগিতেছে। দেশের মুক্তির জন্ত একদল তরুণ যুবা মৃত্যুকে বরণ করিয়া বিপ্লব-অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের মুক্তি-আন্দোলনের ভাব-গুরু ছিলেন, অরবিন্দ। অরবিন্দ তখন তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতেছিলেন। অরবিন্দের সেই ভাব-সাধনায় চিত্তরঞ্জন আকৃষ্ট হন, এবং তাঁহার সামান্ত আয় হইতে সেই আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির জন্ত সহায়তা করেন, কিন্তু গোপনে।

এমন সময় ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট এক বিরাট ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অরবিন্দ এবং তাঁহার অনুচরদিগকে গ্রেফতার করিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে নরহত্যা, ডাকাতি, সশস্ত্র বিদ্রোহ ইত্যাদির অভিযোগ উপস্থাপিত

করা হইল, যাহার দণ্ড হইল ফাঁসি। তখন আইন-ব্যবসায়ীরূপে চিত্তরঞ্জনের পসার জমিয়া আসিতেছিল, সেই সময় তিনি নিজের লাভ-লোকসানের কথা ভুলিয়া এই মৃত্যুপথযাত্রীদের মামলার ভার লইলেন। দিনের পর দিন মামলা চলিতে লাগিল। চিত্তরঞ্জন ঋণ করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন।

রাতের পর রাত জাগিয়া একনিষ্ঠ ব্রতচারী ছাত্রের ন্যায় মামলার অনুশীলন করিয়া চলিলেন। তাঁহাকে সেই অবস্থায় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, এই সময় তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তিনি সাধক, সাধনায় মত্ত হইয়া আছেন। এই মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, তাহাতে বিচারকগণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যান। বিচারে অরবিন্দ মুক্তিলাভ করিলেন। এবং তাঁহার অনুচরবর্গের ফাঁসির বদলে দ্বীপান্তরের দণ্ড বহাল হইল।

এই মামলার পর, ব্যারিষ্টার-রূপে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নাম সর্ব্বোচ্চ স্তরে গিয়া পৌঁছাইল। বন্যার স্রোত অর্থের ধারা আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভারতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার-রূপে তাঁহার খ্যাতি সারা-ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার মাসিক আয় চল্লিশ হাজার টাকা হইল। তাঁহার পিতা দেউলিয়া হইয়াছিলেন সুতরাং আইনতঃ তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অর্থশালী হইয়াই চিত্তরঞ্জন সর্ব্বপ্রথম পিতার নাম হইতে সেই কলঙ্কের স্মৃতিকে মুছাইয়া ফেলিতে চাহিলেন। প্রত্যেক পাওনাদারকে ডাকিয়া সুদসমেত সমস্ত টাকা চুকাইয়া দিলেন। অনেকে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, কাহারও কাহারও দলিল-পত্রও ছিল না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন একটি কপর্দ্দকও কাহারও বাকি রাখিলেন না।

অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভোগবাসনাও পরিস্ফুট

হইয়া উঠিল। তাঁহার বিলাসিতার কথা লোকের মুখে মুখে সারা-ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য তিনি রাজার মত করিয়া ভোগ করিলেন। কিন্তু এই ভোগের মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিল এক অপরূপ বৈরাগ্য। একদিক দিয়া ভাগ্য যেমন তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন, আর একদিক দিয়া তেমনি তিনি সেই ভাণ্ডার বিচারবিহীন দানে শূন্য করিয়া দেন। কোন প্রার্থী তাঁহার নিকট হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায় না। দানের নেশায় তাঁহাকে পাইয়া বসিল। কোথায় কোন্ দরিদ্র ছাত্র অর্থাভাবে পড়িতে পাইতেছে না, কোথায় কোন্ অনাথ বিধবা অর্থাভাবে বিপন্ন, কোথায় কাহার কন্যার বিবাহ হইতেছে না, কোথায় কোন্ সাহিত্যিক অর্দ্ধাশনে রহিয়াছে, চিত্তরঞ্জনের নিকট আসিয়া আবেদন করিলেই হইত। প্রতিমাসের প্রথম তারিখে, একজন মাইনে-করা কেরানী একটা খাতা দেখিয়া মণি-অর্ডার পাঠাইত। বাংলাদেশের কত অনাথ-আশ্রম, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, লাইব্রেরী, সংবাদপত্র যে তাঁহার পরিপূর্ণ দানে পুষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক সময় তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা অনুযোগ করিতেন, এই ভাবে বিচার না করিয়া দান করার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার পর্য্যন্ত করিতেন। কিন্তু তিনি হাসিয়া বলিতেন, আমার কাজ হইল দিয়া রিক্ত হওয়া, কে লইল তাহা জানিবার প্রয়োজন আমার নাই।

এই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র, নিজেকে দিয়া রিক্ত হওয়া।

জীবনের এই পরিপূর্ণ ভোগের মধ্যে তাঁহার নিকট আসিল দেশ-জননীর আহ্বান। যৌবন হইতে তাঁহার অন্তরের মধ্যে প্রকাশ-ব্যাকুল এক কবি থাকিয়া থাকিয়া অপরূপ ছন্দে তাঁহার অন্তরের হাহাকারকে রূপ দিত। তাঁহার যৌবনের সেইসব কবিতা পড়িয়া বোঝা যায়, তাঁহার অন্তরে একটা দুর্ব্বার শক্তি প্রস্তর-বদ্ধ নির্ঝরিণীর

মতন প্রকাশের পথ খুঁজিতেছে। তাহারই প্রেরণায় তিনি জীবনের আনন্দ-উৎসবে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছেন, তাহারই ইঙ্গিতে তিনি দানের আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিতেন, কিন্তু তবুও অন্তরের সেই আলোড়ন থামিতে চাহিত না। যেন তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য চক্ষুর অদৃশ্য-লোকে থাকিয়া ইঙ্গিতে-আভাসে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে, অথচ তাহার স্পষ্ট মূর্ত্তি তিনি ধরিতে পারিতেছেন না। বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া যখন গোপন বিপ্লবী দল মৃত্যু-অভিসারে বাহির হয়, তিনি তাহাদের অন্তরের সহানুভূতি জানাইয়াছেন, অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সেই আন্দোলনে দান করিতে পারেন নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধী যখন অসহযোগ-আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখনও পর্য্যন্ত তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত সেই আন্দোলনের সহিত নিজেকে সংযুক্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা তাঁহার অন্তরের এই সংশয়-আকুলতা সম্পূর্ণভাবে দূর করিয়া দিল। সেই অনাচার-সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তিনি পাঞ্জাবে গমন করেন। নিজের চোখে সেই অনাচারের যে বীভৎস মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। জীবনের যে-চরম লক্ষ্যের জন্য এতদিন তিনি অপেক্ষা করিয়াছিলেন, স্পষ্টমূর্ত্তিতে তাহা সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। দেশের পরাধীনতা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতন তাঁহার দেহমন পুড়াইয়া দিতে লাগিল।

ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোচ্চশিখর হইতে নামিয়া তিনি সবরমতীর ঋষির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সেইদিন হইতে মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন স্বাধীনতার সংগ্রামে রণস্থলেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কোন জিনিসই তিনি আধাআধি

বা আংশিকভাবে করিতে জানিতেন না। যখন দেশের মুক্তির আহ্বানে সংগ্রামে নামিলেন, তখন সম্পূর্ণভাবেই নিজেকে দেশ-জননীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলির মত তুলিয়া ধরিলেন। তাঁহার মধ্যে নিজের বলিতে এতটুকু কিছু রাখিলেন না। এমন একাগ্র অনুরাগ, এমন সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসা কচিৎ দেখা যায়। তাঁহার চিন্তায়, কথায়, স্বপ্নে, জাগরণে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জড়াইয়া গেল।

যে-ব্যক্তির বিলাসিতা ভারত-খ্যাত ছিল, একদিনে তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দীন রিক্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অসহযোগ-আন্দোলনের আহ্বানে তিনি যখন হাইকোর্ট ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার মাসিক আয় চল্লিশ হাজারের উর্দ্ধে এবং হাতে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্রীফ্। এক কথায় একদিনের সঙ্কল্পে চিরকালের মত তাহা ত্যাগ করিলেন। সারাজীবনের বিলাসিতার নানা অভ্যাস জীর্ণবস্ত্রের মত ফেলিয়া দিলেন, আর তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। বজ্রনির্ঘোষে বলিয়া উঠিলেন, "Life is unbearable without Swaraj." এই উক্তির পিছনে যে তীব্র অনুরাগ ছিল, তাহা সকলের অন্তর স্পর্শ করিল। নগ্নপদে এই কলিকাতা শহরের রাজপথ দিয়া যেদিন তিনি দ্বারে দ্বারে দেশের মুক্তি-সাধনার জন্য অর্থ-ভিক্ষায় বাহির হন, সেদিন অতিবড় কৃপণও লৌহ-সিন্দুকের চাবি আনন্দে তাঁহার হাতে তুলিয়া দেয়। তিনি স্থির করিলেন, বাংলাদেশ হইতে দশ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক গড়িয়া তুলিবেন। তাহার জন্য সমগ্র বাংলা তিনি পরিভ্রমণ করিলেন। যেখানে পদার্পণ করিয়াছেন, সেখানেই নব-চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়াই যেন বাংলার জড়ীভূত চেতনা আবার জাগিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সারাদেশের তরুণেরা কংগ্রেসের পতাকার তলায় সমবেত হইল।

সেই আয়োজন দেখিয়া ইংরাজ-সরকার চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত সভা এবং সম্মেলন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং চারিদিকে ১৪৪ ধারা জারি করা হইল। ইংরাজের সেই রক্ত-চক্ষুর ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করিবার জন্য দেশবন্ধু প্রস্তুত হইলেন। সেই আইন ভঙ্গ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম নিজের পুত্র এবং পত্নীকে পাঠাইলেন। তাঁহারা কারারুদ্ধ হইলেন। একদল কারারুদ্ধ হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার স্থলে আর একদল অগ্রসর হয়। দেখিতে দেখিতে কারাগার ভরিয়া উঠিল। সেই সংগ্রামের মধ্যস্থলে একদিন পুলিশ আসিয়া তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেল। পুরনারীরা রক্ত-চন্দনের তিলক পরাইয়া শুভ শঙ্খধ্বনির সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সমগ্র দেশে স্বাধীনতা-আন্দোলনের একটা বিচিত্র অভিনব মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাইতে পারে, "আগে কে বা প্রাণ, করিবেক দান, তারই লাগি কাড়াকাড়ি" পড়িয়া গেল। কারা-ভীতি নিমেষের মধ্যে যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।

১৯২২ সালের জুলাই মাসে দেশবন্ধু যখন কারামুক্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন, সমগ্র দেশ কারাদ্বারে আসিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইল। সেই বৎসরে গয়ায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসে, জাতি তাহার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাহাতে তাঁহাকেই সভাপতি নির্ব্বাচিত করে।

সেই সময় ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট পুরাতন আইনের সংস্কার করিয়া নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই আইনের বলে অংশতঃ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ভারতবর্ষ পাইল। নূতন শাসন-পরিষদের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু দেশবন্ধু নূতন পন্থা লইয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শাসন-ব্যবস্থাকে অচল করিয়া জগতে প্রমাণ করা, এই স্বায়ত্ত-শাসনের মিথ্যা রূপকে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাহাতে যোগদান

করিলেন। নির্ব্বাচনে তিনি দেশখ্যাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিজের দলের তখনও পর্য্যন্ত অখ্যাত কর্ম্মীদের দাঁড় করাইলেন। সুরেন্দ্রনাথের বিপক্ষে দাঁড় করাইলেন বিধানচন্দ্র রায়কে। তখন বিধানচন্দ্র একজন বড় ডাক্তার এই মাত্র। রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে তাঁহাকে কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু যখন নির্ব্বাচনের ফল বাহির হইল, তখন সমগ্র দেশ বিস্ময়ে দেখিল, তাঁহার নির্ব্বাচিত অখ্যাত কর্ম্মীরাই জয়লাভ করিয়াছে। তাহার কারণ, তখন দেশবন্ধুর প্রভাব বাঙালীর মধ্যে এত গভীরভাবে পড়িয়াছিল যে, বাঙালী তাঁহার নির্ব্বাচিত সদস্যকে ভোট দিয়া তাঁহাকেই স্বীকার করিল। এই ভাবে তাঁহার দলবল লইয়া তিনি নূতন শাসন-পরিষদে প্রবেশ করিলেন। এবং শাসন-পরিষদের ভিতরে আমলা-তন্ত্রের সহিত তাঁহার ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু হইল। গভর্ণমেণ্ট বারবার শত চেষ্টা করিয়াও কোন স্থায়ী মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে পারিলেন না।

এই সংগ্রামে দেশবন্ধু তাঁহার সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দেন। যখন পরিষদে সদস্যদিগের ভোটে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স বিল পাশ হইবার কথা, তখন তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য, রোগ-শয্যায় শায়িত। অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার দেহ এতদূর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যে, ডাক্তারেরা উঠিয়া বসিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। সামান্য উত্তেজনা বা পরিশ্রমে সহসা হৃদ্‌যন্ত্র থামিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যেদিন সেই বিল পাশ হইবার কথা, সেদিন তিনি সকলকে ডাকিয়া জানাইলেন, তিনি পরিষদ-গৃহে যাইবেন। যদি তাঁহার একজনের ভোটের অভাবে তাঁহার দল হারিয়া যায়। সে-পরাজয়ের কথা ভাবিতেও তিনি নারাজ।

ডাক্তারেরা প্রমাদ গণিলেন। যে রোগীর শয্যা হইতে উঠিয়া বসিবার অধিকার নাই, সে রোগী কি করিয়া এতদূরে শাসন-পরিষদে যাইবে। কিন্তু তিনি অবিচল। পরাজয়ের অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। আর

এ-জীবন তো দেশের পায়ে তিনি সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

নেপথ্যে ডাক্তারদের ডাকিয়া বাসন্তী দেবী বলিলেন, উনি যখন যাইবেন বলিয়াছেন, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও যাইবেন! অতএব ইহা লইয়া তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই।

সেই অবস্থায় ষ্ট্রেচারে করিয়া তিনি পরিষদ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সংগ্রামের সেই জীবন্ত মূর্ত্তিকে দেখিয়া শত্রু মিত্র, বিপক্ষ-স্বপক্ষ সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল। ভোটে সরকার পরাজিত হইল কিন্তু গভর্ণর সদস্যদের উপেক্ষা করিয়া নিজের অতিরিক্ত ক্ষমতার বলে সেই বিলকে আইনে পরিণত করিলেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ভিতর হইতে তাঁহার প্রাণশক্তির ভাণ্ডার শুকাইয়া আসিয়াছিল। তবুও অন্তরের তেজে তিনি তাহাকে অস্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইলেন কিন্তু মানুষের সমস্ত শক্তি একটা সীমার পর আর অগ্রসর হইতে পারে না। ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সের পর ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তিনি দার্জ্জিলিঙে আসিলেন। এতদিনের পথ-চলার পর সেই বিশ্রাম। এবং সেই বিশ্রামই শেষ-বিশ্রাম হইল। সারাজীবন দিতে দিতে নিজেকে রিক্ত করিয়া আসিয়াছেন, শেষকালে প্রাণ-স্পন্দনটুকুও মৃত্যুর হস্তে তুলিয়া দিয়া রাজ-তপস্বী মহাপ্রয়াণ করিলেন। যখন অকস্মাৎ এই সংবাদ দেশবাসীর কানে আসিয়া পৌঁছাইল, সকলে কাঁদিয়া উঠিল; প্রত্যেকেরই মনে হইল, যেন তাহার অতি-আপনার জনকে সে আজ হারাইয়াছে!

দেশবন্ধুর নিকট রাজনীতি একটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস ছিল। তাঁহার রাজনীতির মূল কথা হইল, সর্ব্ব-মনপ্রাণ দিয়া দেশকে ভালবাসা। তাই তাহা ছিল, তাঁহার শুধু কর্ম্ম নয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই তীব্র অনুরাগ তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন, এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে।

তিনিই প্রথম কৃষক ও শ্রমিকদের বেদনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কংগ্রেস-

আন্দোলনকে জাতির সেই মহাবঞ্চিতদের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। চাঁদপুরে যেদিন চা-বাগানের অসহায় কুলীরা সর্ব্ব-আশা ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ-আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল, সেদিন ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পদ্মার উত্তাল তরঙ্গ জেলে-ডিঙিতে পার হইয়া তিনি তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়ান। সেদিন ভয়ে মাঝিরা পর্য্যন্ত জলে নামিতে সাহস করে নাই।

তিনিই প্রথম ভারতবর্ষের বাহিরে সমগ্র এশিয়ার দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের মুক্তির সঙ্গে সমগ্র এশিয়ার মুক্তি বিজড়িত। সেদিন কল্পনায় তিনি সেই মহাদিনকে আহ্বান করিয়া গিয়াছিলেন, যেদিন তাঁহার পরবর্ত্তীকালে তাঁহার পুত্র-তুল্য পণ্ডিত জওহরলাল দিল্লীতে এশিয়া-কন্ফারেন্সের উদ্বোধন করেন।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনে তিনিই প্রথম আন্তর্জাতীয়তার শঙ্খ ধ্বনিয়া তোলেন। আজ দিকে দিকে সেই শঙ্খেরই রোল উঠিতেছে।



মওলানা আবুল কালাম আজাদ

এই ভেদ-সংক্ষুব্ধ যুগে, যে-কয়েকটি অতিমানব, জ্ঞানের আলোক-দীপ হাতে লইয়া, সমস্ত ভেদ-বুদ্ধির অনাচারের উর্দ্ধে মানবতার কল্যাণ-আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, মওলানা আবুল কালাম, আজাদ তাঁহাদের অন্যতম। ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যার মত সম্প্রদায়গত ঈর্ষ্যাও মানুষের বিচার-শক্তিকে সাময়িকভাবে কলুষিত করিয়া দেয়। মানব-সভ্যতার পক্ষে এত বড় মারাত্মক ব্যাধি আর কিছু নাই। যখন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, সেই সময় দুরন্ত ব্যাধির জীবাণুদের মতন,

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এমন সংক্রামক জিনিস বুঝি জগতে আর দুইটি নাই! সেই সময়, যে-মানব কিছুতেই নিজের বিচার-শক্তিকে কলুষিত হইতে দেন না, কোন স্বার্থ, কোন প্রলোভন বা কোন উত্তেজনায় যিনি সেই সংক্রমণের স্পর্শ গ্রহণ করেন না, মানব-বন্ধুরূপে জগৎ তাঁহাকে অর্ঘ্য দিয়া থাকে। সাময়িক মূল্যে তাঁহারা পরমার্থকে বিকাইয়া দেন না। হয়ত তাহার জন্য সমসাময়িকের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, হয়ত তাহার জন্য মৃত্যু বা মৃত্যু-অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সেই সাময়িক উত্তেজনা কাটিয়া গেলে দেখা যায়, যাহারা সেদিন আঘাত করিয়াছিল, লাঞ্ছনা দিয়াছিল, তাহারাই সকলের আগে শ্রদ্ধার অঞ্জলি লইয়া আসিয়াছে। জগতে বহুবার অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের চক্ষুর সম্মুখেও তাহা ঘটিতেছে। তাই এই ভেদ-সংক্ষুব্ধ ভারতবর্ষে যখন আবুল কালাম আজাদের অবিচলিত প্রজ্ঞা-সুন্দর মূর্ত্তির দিকে ফিরিয়া চাই, মানব-ইতিহাসের এই হীন ত্রুটির কথা আপনা হইতেই স্মরণ-পথে জাগিয়া উঠে। মানুষের সাময়িক উত্তেজনা সময়ের সহিত মিলাইয়া যায়; যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব, যাহা মঙ্গল তাহা তখনও সমান দীপ্তিতে ভাস্বর থাকে।

তোমরা অনেকেই হয়ত জান না যে, মওলানা আজাদ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই মাটীর কোলে যে মাটীর সঙ্গে ইসলামের অভ্যুদয়ের স্মৃতি অক্ষয়ভাবে বিজড়িত হইয়া আছে। ইসলামের পুণ্যতীর্থ মক্কাধামে তিনি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন আরবে, শিক্ষাগ্রহণ করেন মিশরে, কর্ম্ম-জীবন যাপন করেন ভারতবর্ষে। তাই সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের সঙ্গে তিনি আন্তরিকভাবে জড়িত। কায়রোর জগৎ-খ্যাত আল্-আজ্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইসলাম-শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান

জগতে বিস্ময়কর প্রতিভা হিসাবে যদি তিনজনের নাম করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে একজন হইবেন মওলানা আজাদ। এক বিস্ময়কর মেধা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার মাত্র পনরো বৎসর বয়স, সেই সময় দুরূহ আরবী এবং পারসী ভাষায় তিনি এতদূর কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন যে জ্ঞান-প্রবীণ মওলানারা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট তটস্থ হইয়া থাকিতেন। এবং সেই কিশোর-কালেই তিনি সমগ্র ইসলাম-দর্শনতত্ত্ব একপ্রকার কণ্ঠস্থ বলিতে পারিতেন। তাঁহার পিতাও একজন মহাপণ্ডিত লোক ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া পারস্য, আরব, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ১৯০৮ সালে যখন ভারতবর্ষে তিনি দেহরক্ষা করেন, তখন সারাজগতে তাঁহার শতসহস্র শিষ্য ছিল। অনেকেই অনুমান করিয়াছিল যে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বোধ হয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই শিষ্যদের লইয়া ধর্ম্ম-জীবনই যাপন করিবেন।

কিন্তু সেই কিশোর-কালে পৃথিবীর নানাদেশ পর্য্যটন করার ফলে, তাঁহার অন্তরে নূতন জগতের নূতন ভাবধারা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। সমস্ত ইসলামীয় রাষ্ট্রের সহিত তিনি সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে, মুসলমানদের সামাজিক অধোগতি এবং ভয়াবহ দৈন্য দেখিয়া তিনি সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। কুসংস্কারের হাত হইতে ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান-সমাজকে রক্ষা করিয়া এক পূর্ণতর জীবনের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই সেই কিশোর-কালেই তিনি আল্-হিলাল নামে একখানি উর্দ্দু কাগজ প্রকাশিত করিলেন এবং আজাদ এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আজ এই ছদ্মনামেই

তিনি বিশ্ববিখ্যাত। দেখিতে দেখিতে আল্-হিলালের খ্যাতি ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া সমস্ত ইসলামীয় রাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়িল। আজাদ মানে হইল মুক্ত। সত্যই তিনি সর্ব্ব-বন্ধনের হাত হইতে নিজের অন্তরকে মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অপরূপ সাহিত্য পড়িয়া সারা-দুনিয়ার তরুণ মুসলিমরা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এমন ভাষা বহুদিন আর কেহ লিখে নাই। কিন্তু এই ক্ষুরধার সত্যের অভিযানের ফলে, সমাজের মধ্যে প্রাচীনপন্থীরা রাগিয়া উঠিলেন, চিরকালই নবীনের অভিযানে এই ভাবে প্রবীণেরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। মনে মনে তাঁহারা বুঝিতে পারেন, "পুরানো সম্বল লইয়া বেচাকেনা আর চলিবে না," নূতন প্রাণ লইয়া, নূতন শক্তি লইয়া যে নব-নবীন আসিয়াছে তাহাকে আসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাই তাঁহারা বিচলিত হইয়া উঠেন। স্ব-সমাজের একশ্রেণীর লোক এই ভাবে এই তরুণ-অভ্যুদয়কে লাঞ্ছনা দিয়া দমন করিতে চাহিল, অপর দিকে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিও এই নূতন লেখনী-নায়কের উপর আসিয়া পড়িল। ইংরাজ-শাসনের মর্ম্মমূলে আজাদের লেখনী গিয়া আঘাত করিল। আতঙ্কিত চিত্তে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট লক্ষ্য করিল, এই তরুণ সম্পাদকের অগ্নিবাণী জড়ীভূত মুসলমান-সমাজকে সচেতন করিয়া তুলিতেছে। লণ্ডনে বৃটিশ পার্লামেণ্টে আল্-হিলালকে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য আলোচনা চলিল। ফলে আল্-হিলালের জমা টাকা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল এবং নূতন করিয়া দশ হাজার টাকার জামিন চাহিল। বাধ্য হইয়াই আল্-হিলাল বন্ধ করিয়া দিতে হইল। কিন্তু আজাদ পরাজয় স্বীকার করিলেন না। আল্-বে-বালাখ নামে নূতন আর একখানি কাগজ বাহির করিলেন। সরকার ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চারিদিকে নিষেধের পাঁচিল তুলিল। হুকুম হইল, তিনি পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, বম্বে এবং পরে বাংলাদেশে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। তাহাতেও সরকার যখন

দেখিল, সেই তরুণ বিদ্রোহীকে ঠাণ্ডা করা গেল না, তখন রাঁচী শহরে তাঁহাকে নজরবন্দী হিসাবে আটক করিয়া রাখা হইল। চার বৎসর এই ভাবে অবরুদ্ধ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিবার পর ১৯২০ সালে তিনি যখন মুক্ত হইলেন, তখন সোজা মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ-আন্দোলনে আসিয়া যোগদান করিলেন এবং আজও পর্য্যন্ত সে-যোগ তেমনি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

পরের বৎসর তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হইলেন। বিচারে এক বৎসর কারাদণ্ড হইল। কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর। ইহার পূর্ব্বে বা পরে এত কম বয়সে আর কেহই সেই গুরুদায়িত্বভার বহন করেন নাই। জওহরলাল যখন সভাপতি হন, তখন তাঁহার বয়স ৩৯। তাঁহার অভিজ্ঞতা এবং পরিচালন-ক্ষমতার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া দেশবাসী পুনরায় জাতির অতি সঙ্কট-লগ্নে তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতির ভার অর্পণ করে এবং তিনি যে-নিপুণতার সঙ্গে সেই সঙ্কট-কালে কংগ্রেসকে পরিচালনা করেন, তাহা সকলের চক্ষুর সম্মুখেই ভাসিতেছে। যে-আন্দোলনের ভার একদিন গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ পরম সৌভাগ্য যে তাহাকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষা-সচিবরূপে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া দুষ্কর হইত।

তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিলেই স্পষ্ট দেখা যায়, তাঁহার চোখ-মুখ হইতে যেন বুদ্ধির আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। এযুগের অনেকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, ইংরাজী ভাষা না জানিলে, কোন মানুষ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতে পারে না। মওলানা আজাদ তাহার জীবন্ত প্রতিবাদ। পরিণত বয়সেই তিনি ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির ঠিক আগে বিলাত হইতে আগত মিশনের সহিত যখন ভারতীয় নেতাদের আলাপ-আলোচনা হইতেছিল, সেই ঐতিহাসিক

আলোচনায় মওলানা আজাদ ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন না। সেইজন্য তিনি সঙ্গে করিয়া তাঁহার সেক্রেটারীকে লইয়া যাইতেন। তিনিই দোভাষীর কাজ করিতেন। আজ শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারত-বর্ষের বাহিরে, আরবে, মিশরে, তুরস্কে, পণ্ডিত লোকেরা যখনই কোন কূট সমস্যার সম্মুখীন হন, তখন মওলানা আজাদের শরণাপন্ন হইতে দ্বিধাবোধ করেন না। বর্ত্তমান জগতের পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধানতম।



পণ্ডিত জওহরলাল

ভারতবর্ষের বাহিরে আজ সমগ্র রাজনৈতিক জগৎ, ভারতবর্ষ বলিতে একটি লোককে জানে, সে লোকটি হইলেন মুক্ত-ভারতের প্রথম প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ভারতবর্ষের বাহিরে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জওহরলাল অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে-ভাবে ভারতবর্ষের মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ভারতবর্ষের বাহিরে জওহরলাল হইলেন, ভারতবর্ষের মর্য্যাদার প্রতীক। ভারতবর্ষের ভিতরে জওহরলাল হইলেন, ভারতের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

যে-পরিবারে জওহরলাল জন্মগ্রহণ করেন, জগতের ইতিহাসে সেই পরিবারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হইয়া গিয়াছে। একমাত্র ঠাকুর-বংশ ব্যতীত ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে একটা জাতির ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে একটা পরিবারের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর কাহারও নাই। সেই সঙ্গে আমরা পরম বিস্ময়ে ও গর্ব্বে ইহাও দেখিয়াছি, এমন পিতার এমন পুত্রও জগতে দুর্লভ। পণ্ডিত মতিলাল যে-সাধনা অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র তাহা সম্পন্ন করিলেন।

"নেহরু" কথাটার সহিত এই ঐতিহাসিক পরিবারের অতীত কাহিনী বিজড়িত হইয়া আছে। উর্দ্দু ভাষায় যে-কথা হইতে নেহরু-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার মানে হইল খাল। তাঁহাদের আদিম বাড়ীর চারিদিকে একটা পরিখা ছিল। সেই থেকে তাঁহাদের নাম নেহরু বলিয়া সমাজে পরিচিত হয়।

ভূস্বর্গ কাশ্মীর হইল তাঁহাদের আদিম বাসভূমি। দিল্লীর শেষ-বাদশাহের আমলে তাঁহারা দিল্লীতে চলিয়া আসেন। সেখান হইতে পণ্ডিত মতিলাল এলাহাবাদে আসিয়া তাঁহার প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। এই অট্টালিকার নাম আনন্দ-ভবন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই আনন্দ-ভবনের নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে। জাতির সেবায় এই ভবনকে মতিলাল জাতির হাতেই তুলিয়া দিয়া যান।

এই প্রাসাদোপম ভবনে ভারতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীর ঘরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল জন্মগ্রহণ করেন। রাজকীয় ঐশ্বর্য্য আর বিলাসিতার মধ্যে জওহরলাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মতিলাল তখন উত্তর-ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীব। এত বড় বিলাসী এবং শৌখীন ব্যক্তি সে-সময় ভারতবর্ষে ছিল না বলিলেই হয়। তাঁহার বিলাসিতার নানা কাহিনী লোকের মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইত।

এই আনন্দ-ভবন ছিল এলাহাবাদের প্রাণ-কেন্দ্র। প্রদেশের ইংরাজ-

গভর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা-মহারাজারা সেখানে বন্ধু-রূপে যাওয়া-আসা করিতেন। উৎসবে, ভোজে, আনন্দে আনন্দ-ভবন সর্ব্বদাই সরগরম হইয়া থাকিত।

এই ভোগের আর ঐশ্বর্য্যের লীলানিকেতনে পিতার একমাত্র পুত্ররূপে জওহরলাল সৌভাগ্যের চরম স্বাদ গ্রহণ করেন। শিশুকাল হইতেই মেম-গভর্ণেসের কোলে তিনি মানুষ হইয়াছেন। সাহেব-শিক্ষকের পাশে বসিয়া জীবনের প্রথম-পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সময়কার একজন বিখ্যাত আইরিশ শিক্ষককে জওহরলালের গৃহ-শিক্ষকরূপে পণ্ডিতজী নিযুক্ত করেন। বাড়ীর ভিতরেই শিশু-পুত্রের শিক্ষা এবং ক্রীড়ার সমস্ত আয়োজনের বন্দোবস্ত তিনি করেন। প্রাসাদের দ্বারের বাহিরে যাইবার হুকুম ছিল না। সাধারণ গৃহস্থের ছেলেদের সঙ্গে পাছে মেশামিশি করিতে হয় বলিয়া অভিজাত পিতা পুত্রকে স্কুলে পর্য্যন্ত দেন নাই। বাড়ীতেই তাঁহার জন্য শিক্ষার সম্পূর্ণ আয়োজন করেন। এমন কি বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য একটা স্বতন্ত্র ল্যাবরেটরী করিয়া দেন। এই ভাবে পণ্ডিত মতিলাল সর্ব্ব-প্রযত্নে পুত্রকে বাইরের সংক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। তখন বিধাতা-পুরুষ হয়ত অলক্ষ্যে থাকিয়া হাসিয়া থাকিবেন। যে-ব্যক্তি পরবর্ত্তী জীবনে জনসাধারণের একমাত্র নায়ক হইবেন, শৈশবে তাঁহাকে তাহাদের সংস্পর্শ হইতেই দূরে রাখিবার তিনি সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিশুর মন সেই রুদ্ধ-দ্বারের বাইরের জগতের দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত। যে-জগৎ হইতে তাঁহাকে দূরে রাখা হইয়াছে, সেই জগৎই তাঁহাকে সকলের চেয়ে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিত।

জওহরলালের বয়স যখন পনরোয় আসিয়া পড়িল, সেই সময় পণ্ডিত মতিলাল পুত্রকে সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া আসিলেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পুত্রকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া আসিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে হ্যারোর স্কুলের খ্যাতি বিশ্ববিদিত। এই

বিদ্যালয় হইতে ইংলণ্ডের অভিজাত-শ্রেণীর ছেলেরা ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার সুযোগ পাইয়া আসিতেছে। পণ্ডিত মতিলাল পুত্রকে সেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিলেন। তখন জওহরলালের সতীর্থরূপে আর দুইজন ভারতীয় ছাত্র সেখানে ছিলেন, একজন বরোদার গায়কোয়াড়ের পুত্র, আর একজন ছিলেন তখনকার কর্পূরতলার মহারাজার পুত্র।

এই হ্যারোর স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া জওহরলাল কেম্ব্রিজের বিশ্ববিখ্যাত ট্রিনিটী কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে বিজ্ঞানে ট্রাইপস্ লইয়া গ্রাজুয়েট হইলেন। তারপর ব্যারিষ্টারী পড়িতে শুরু করিলেন। ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া সাত বৎসর পরে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজে বাস করিয়া, সেখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা আয়ত্ত করিয়া জওহরলাল ফিরিয়া আসিলেন। তখন কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে, সেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক হইবে এই যুবক?

ব্যারিষ্টার-রূপে প্রথম ভারতবর্ষে পা দিয়া তিনি নিজের জীবনের ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বিচলিত হইয়া পড়েন। যদিও বাড়ীতে ছেলেবেলা হইতে ইংরাজদের সহিত মেলামেশা করিয়াছেন এবং জীবনের কোমলতম কাল সেই ইংরাজদের সহবাসেই অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি মনের ভিতরে কোথায় কুশাঙ্কুরের মতন বিঁধিত, নিজেদের পরাধীনতার দৈন্যের কথা। কিন্তু যে-আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ হইয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ারও কোন সুযোগ ছিল না।

সেই সময় স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়ে। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিভাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে সেই প্রবীণ রাজনৈতিক বুঝিয়াছিলেন, তরুণের স্বাভাবিক সঙ্কোচ এবং কুণ্ঠার

জওহরলাল যেন আড়ষ্ট হইয়া আছেন। এই আড়ষ্ট-ভাব দূর করিতে না পারিলে, কিছুতেই ভাল ব্যারিষ্টার হইতে পারিবেন না। তিনি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য বারবার জওহরলালকে অনুরোধ করেন কিন্তু জওহরলাল ভয়ে পিছাইয়া যান। আজ যাঁহার কণ্ঠস্বরে ভারতের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ভূখণ্ড কাঁপিয়া উঠিতেছে, ভাবিতে বিস্ময় লাগে, সেদিন যৌবনে তিনি জনতা দেখিলে একেবারে মূক হইয়া যাইতেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম এক প্রকাশ্য সভায় স্যার তেজ-বাহাদুর সপ্রুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি বক্তৃতা দিবার জন্য অগ্রসর হন। সেই অভিজ্ঞতা তাঁহার অপরূপ আত্মচরিতে তিনি লিখিতেছেন, "সভা-সমিতিতে কথা বলিতে আমার ভয় করিত। সে-কথা ভাবিতেই আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিতাম। বিশেষতঃ তখন হিন্দুস্তানীতে আমি ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিতাম না। প্রেস-আইনের প্রতিবাদকল্পে এই সভা আহ্বান করা হয়। স্যার তেজ-বাহাদুরের কথা কোনমতেই এড়াইতে না পারিয়া এই সভায় উপস্থিত হই। সভায় হিন্দুস্তানীতেই সকলে বক্তৃতা দিতেছিলেন। আমিও হিন্দুস্তানীতে বক্তৃতা দিব, তাহাই স্থির হয়। কিন্তু বক্তৃতা দিতে উঠিয়াই, কোন রকমে পাঁচ মিনিট কাল ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলাম। তাহার পর বসিয়া পড়ি। কিন্তু তাহাতে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এত আনন্দিত হন যে, সভার শেষে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করেন।"

মহাত্মা গান্ধীর সহিত জওহরলালের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তখন এই সাক্ষাৎকারের কোন প্রভাব তাঁহার উপর পড়ে নাই।

ক্রমশঃ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা জটিলতর হইয়া উঠিতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ-আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য তখন ভারতবর্ষের প্রত্যেক সমাজ-নেতার সহিত আলোচনা করিতেছেন। পণ্ডিত

মতিলালকে তিনি এই আন্দোলনে আকর্ষণ করিয়া আনিবার জন্য আনন্দ-ভবনে যাতায়াত করিতেছেন। চিরদিনের অভ্যস্ত বিলাস এবং সুখজীবন ত্যাগ করিয়া এই কণ্টক-সঙ্কুল পথে নামিবার জন্য পণ্ডিত মতিলালও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের গোপনতম স্থলে একটি গোপন বাধা তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল। তিনি নিজের দুঃখকষ্টের কথা ভাবিতেছিলেন না, স্নেহময় পিতা তখন ভাবিতে-ছিলেন পুত্রের কথা। ইদানীং তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, জওহরলালের অন্তরের পরিবর্তন। দেশের মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক হইবার জন্য তাঁহার আকুলতা পিতার দৃষ্টি এড়ায় নাই। পণ্ডিত মতিলাল পুত্র-স্নেহে এতই বিচলিত হইয়া পড়েন যে, জওহরলাল তাঁহার অনুগামী হইয়া এই আন্দোলনে যদি যোগদান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকেও কারাবরণ করিতে হইবে। চিরকাল যে সুখ-ঐশ্বর্যে লালিত হইয়াছে, সে কি কারা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবে? সংগোপনে তাঁহার অন্তরে এই চিন্তাই পীড়া দিতেছিল। একদিন রাত্রিবেলায় যখন সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তিনি নীচে চাকরদের ঘরে গিয়া খালি মাটীতে শুইয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য, পরীক্ষা করিয়া দেখা খালি মাটীতে শুইতে কতখানি কষ্ট হয়। হায়, স্নেহান্ধ পিতার অন্তর!

অবশেষে একদিন আসিল দুকূলপ্লাবী জোয়ার। ভাসিয়া গেল সব দুর্ভাবনা, সুখদুঃখ-বোধের ছোটখাট সব কণ্টক। মহাশঙ্খের আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিল পণ্ডিত মতিলালের অন্তর। পুত্র জওহরলালও এই লগ্নের অপেক্ষায় ছিলেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনিও সেই ভারতব্যাপী জোয়ারে অঙ্গ ভাসাইয়া দিলেন। পিতা এবং পুত্র একই তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কংগ্রেস হরতাল ঘোষণা করিয়াছে। পথে পথে স্বেচ্ছাসেবকের দল সেই বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।

এলাহাবাদে প্রথম দলে বাহির হইলেন জওহরলাল। অন্যান্য সকলের সঙ্গে কারারুদ্ধ হইলেন।

কারাভীতি ভাঙ্গিয়া গেল। প্রথম কারাবাস অবশ্য বেশীদিনের জন্ত হয় নাই। তাহার কয়েক সপ্তাহ পরেই আবার কারারুদ্ধ হইলেন। বিদেশী-বস্ত্র-বর্জ্জন আন্দোলনে দোকানীদের অনুরোধ করিবার সময় গ্রেফতার হইলেন। এবার বিচারে এক বৎসর নয় মাস কারাদণ্ড হইল।

কারাগারের লাঞ্ছনা দিল জীবনের চরম দীক্ষা।

১৯২৩ সালে কোকনদ কংগ্রেসে সভাপতি হইলেন মওলানা মহম্মদ আলী। কারামুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মওলানা সাহেব তাঁহাকে একেবারে নিজের পাশে টানিয়া লইলেন। তরুণ জওহরলালকে তিনি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত করিলেন। সেই হইতে কংগ্রেসের দায়িত্ব তিনি প্রত্যক্ষভাবে বহন করিয়া আসিতেছেন।

এই সময় ভারতবর্ষের প্রত্যেক জন-নেতার জীবন একই ছন্দে একই ধারায় প্রবাহিত হয়। মহাত্মা গান্ধীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা প্রত্যেকেই বিনা-প্রতিবাদে যুদ্ধরত সৈনিকের মত তাঁহার আদেশ পালন করিয়া গিয়াছেন। কারাগার এবং কারামুক্তি, এই দুই বিন্দুর মধ্যে তাঁহাদের জীবন বারবার যাতায়াত করিয়াছে।

১৯২৯ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইহার পূর্ব্বের বৎসর পণ্ডিত মতিলাল সভাপতি ছিলেন। পিতার নিকট হইতে পুত্র যেন উত্তরাধিকার-সূত্রে সেই অধিকার পাইল।

ইহার পর তাঁহার জীবন কারা-কণ্টকিত। বাহিরের আলো-বাতাস একাদিক্রমে তিনি বেশীদিন ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনে ক্রমান্বয় এগারো বার তাঁহাকে কারাগমন করিতে হইয়াছে। এই বারবার কারাবাসের ফলে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত সুখসাধ স্বপ্নে

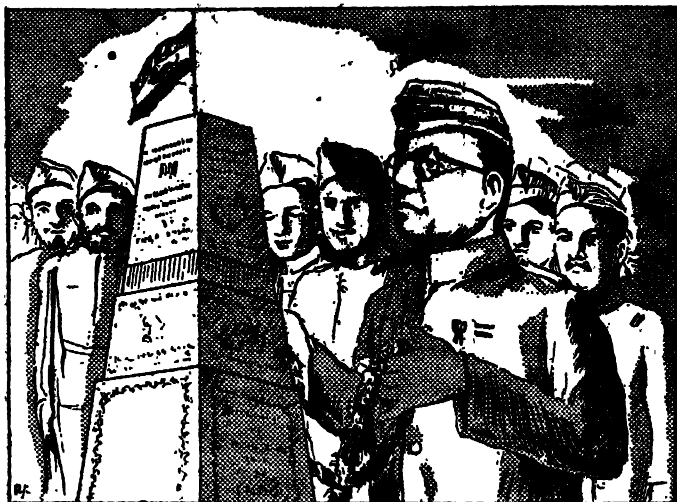
পরিণত হইয়া যায়। সংসার তাঁহার নিকট হইতে যেন লক্ষ যোজন দূরে সরিয়া যায়। পীড়িত পত্নীর সেবা করিবার অবকাশও তিনি পান নাই।

তাঁহার অন্তরে একটা অপরূপ সৃজনী-শক্তি ভগবান স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য-স্বরূপ দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরের সেই কবি-প্রকৃতির পরিচয় তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্য-রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার আত্মজীবনী ইংরাজী ভাষায় লিখিত জগতের মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ আত্মচরিত-গ্রন্থ। এই আত্মচরিত-কাহিনী পাঠে, তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের আড়ালে তাঁহার সাহিত্যিক সত্বাকে উপলব্ধি করা যায়। প্রকৃতির মুক্ত রূপ, নির্জ্জন পর্ব্বত-পথ, গভীর অরণ্য, তাঁহার অন্তরকে আকর্ষণ করে। যখনই কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনে সামান্ত অবসর মিলিয়াছে, অমনি তিনি হিমালয়ের তুহিন-পথে একা পায়ে হাঁটিয়া পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সেই প্রাকৃতিক নির্জ্জনতার মধ্য হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া আবার তিনি কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহার আত্মচরিতে তিনি লিখিয়াছেন, "আমার মধ্যে দেশ-ভ্রমণের একটা দুরন্ত ক্ষুধা ছিল। কিন্তু জেল-ভ্রমণেই সে-ক্ষুধা আমাকে মিটাইতে হইয়াছে

জাতির সঙ্কটের লগ্নে দুইবার তিনি জাতির ভাগ্য-পরিচালক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আজ একমাত্র মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত, ভারতবাসী এত নির্ভর আর কাহারও উপর করে না।

যেদিন ইংরাজের সহিত শেষ-মীমাংসার ফলে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হইল, সেদিন সেই নূতন রাষ্ট্রের ভাগ্য-পরিচালক কে হইবে, সে-সম্বন্ধে কোন ভারতবাসীর দ্বিমত ছিল না। এই নূতন রাষ্ট্রের ভাগ্য-পরিচালকরূপে এই অতি অল্পকালের মধ্যে জগতের সঙ্গে যে গৌরবান্বিত সম্পর্ক তিনি গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। প্রধান-মন্ত্রিত্ব ছাড়া, জওহরলাল পররাষ্ট্র-বিভাগেরও মন্ত্রী। আন্তর্জাতিক

সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান, জগতের অন্যান্য দেশের জন-নায়কদিগে সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্প্রীতির সম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে তাঁহার উদা মানব-ধর্ম্মী রাজনীতি, আজ ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার ক্ষে বহুদূর অগ্রসর করিয়া লইয়া গিয়াছে। যেদিন তিনি এই নূতন রাষ্ট্রের ভা গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে বিশ্রাম কাহাকে বলে তাহা জানেন না তাঁহার কর্ম্মশক্তি আজিকার যুবকদের আদর্শ হইয়া আছে। দিনের প দিন এমন গিয়াছে যখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টাই তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এমন কর্ম্ম-উম্মাদ নেতা সকল জাতি ভাগ্যে ঘটে না। ভারতবর্ষের পরম সৌভাগ্য যে আজ তাহার ভাগ্য পরিচালকরূপে জওহরলালের মত একজন চির-যুবাকে সে পাইয়াছে। ১।



স্বাধীনতা-আন্দোলনের শেষ-সংগ্রাম

সুভাষচন্দ্র

আজ সমগ্র বাংলাদেশ, সজল-নয়নে দূর পথের দিকে চাহিয়া আছে, এই পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সন্তান, এই পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে সে, যে বাংলা ছাড়া আর কিছু জানিত না, বাংলা বলিতে যাহাকে বোঝায়, বাঙালী বলিতে যাহাকে বোঝায়, এই পথ দিয়া সে চলিয়া গিয়াছে, বাংলার হৃত-মর্য্যাদাকে ফিরাইয়া আনিতে। এই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে সকলে, ফিরিয়া আসিয়াছে বাংলার হৃত-মর্য্যাদা। কিন্তু আজও ফিরিয়া আসে নাই বাংলার সুভাষ, বাঙালীর সুভাষ। তাই অশ্রু-সজল চোখে আজ একটা সমগ্র জাতি, আপনার

অতীত আশায় বুক বাঁধিয়া দূর পথের দিকে চাহিয়া আছে, কখন আসে তাহার বিজয়ী রথ, কখন ফিরিবে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয়ী সৈনিক ? আজ সমগ্র দেশের ভিতর হইতে তাই একটি প্রশ্ন সকলের অন্তরে সমানভাবে দোলা দিতেছে, সুভাষ কি ফিরিবেন না ?

এমন করিয়া একটা জাতির অন্তর জয় করিয়া লইতে ইদানীং আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। সুভাষচন্দ্রকে বাঙালীরা যে ভালবাসে, তাহার পিছনে কোন কারণ নাই, কোন যুক্তি নাই, আপনার একান্ত প্রিয়জনকে মানুষ যেমন সহজে ভালবাসে, জননী যেমন সহজে তাহার সন্তানকে ভালবাসে, স্ত্রী যেমন সহজে তাহার স্বামীকে ভালবাসে, তেমনি সহজভাবে প্রত্যেক বাঙালী সুভাষচন্দ্রকে ভালবাসে।

একদিন ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালী জাতির খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সকলের অপেক্ষা বেশী ছিল। স্বনামখ্যাত গোখলে বলিয়াছিলেন, "বাঙালী আজ যাহা চিন্তা করিতেছে, কাল সমগ্র ভারতবর্ষ তাহা চিন্তা করিবে।" বাঙালীর এই অধিনায়কত্ব একদিন কেহই প্রতিবাদ করিত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধুনা বাঙালীর সেই মর্য্যাদা বাঙালী হারাইয়া ফেলিতেছিল। সর্ব্বক্ষেত্রে সে পিছাইয়া পড়িতেছিল। এমন দিন আসে, যখন বাংলার বাহিরে বাঙালীর দিকে অঙ্গুলী দেখাইয়া অন্য প্রদেশের লোকেরা ব্যঙ্গ করিত। বাঙালীর এই নিদারুণ অধোগতির দিনে, সুভাষচন্দ্র একা বাঙালীর সেই মর্য্যাদাকে ফিরাইয়া আনেন। তাঁহার জীবন ও সাধনায়, তাঁহার চরিত্রের গুণে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষ এবং জগতের মধ্যে বাঙালীর সেই বৈশিষ্ট্যকে পুনরুদ্ধার করেন। বাঙালী তাঁহার মধ্যে তাহার সমস্ত হারানো সম্পদ ফিরাইয়া পাইল।

বাংলাদেশ হইতে দূরে কটকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুআরি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কটকেই তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়।

কটকের র‍্যাভেনশ' স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

সেই কিশোর-কাল হইতেই তাঁহার জীবনের ধারা অন্য ছেলেদের জীবন হইতে স্বতন্ত্র খাতে বহিতে থাকে। সেই সময় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের রচনা এবং তাঁহার জীবনী পড়িয়া, সেই মহাপুরুষকেই তাঁহার জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ দেশের তরুণদের সমাজ-সেবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। চরিত্রকে সুপবিত্র রাখিয়া দেশ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করা, এই ছিল বিবেকানন্দের উপদেশ। কিশোর সুভাষচন্দ্র তাহা গুরুর আদেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লন।

সেইজন্য স্কুলে পড়িবার সময়ই তিনি ছাত্রদের লইয়া দল গঠন করেন। দরিদ্রদের অন্নসংস্থান, ব্যাধিগ্রস্তদের সেবা ছিল তাঁহাদের কার্য্য। সেই কিশোর-কাল হইতেই তিনি এই ভাবে জন-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতর ধর্ম্মভাব এত প্রবল হইয়া উঠে যে, একদিন বাড়ীর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, তিনি একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তীর্থে তীর্থে তিনি গুরুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু কোথাও মনোমত গুরুর সন্ধান না পাইয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন এবং কলেজের পড়ার মধ্যে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু কিশোর-কালে জন-সেবার যে-আদর্শ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে একদিনের জন্যও বিচ্যুত হইলেন না।

এই সময় সারাদেশের মধ্যে জাতীয়তার যে-নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল, তাহা তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিল। যে-সমস্ত তরুণ বিপ্লবী দেশের জন্য হাস্য-মুখে জীবন বিসর্জ্জন দিল, তাহাদের আদর্শ তাঁহার অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়া গেল। সেই সময় সমধর্ম্মী কয়েকজন সহপাঠী মিলিয়া তাঁহারা নিজেদের আত্মিক উন্নতির জন্য একটা দল গঠন

করিলেন। সর্ব্ব-উপায়ে নিজেকে প্রস্তুত করা হইল, এই দলের প্রধান লক্ষ্য। সেইদিন হইতেই তিনি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাসীর মতন কৃচ্ছ্রসাধন করিবার সঙ্কল্প করেন। নিজের শরীরকে দৃঢ় করিবার জন্য শান্তিপুরে গঙ্গাজলে শীতকালে আবক্ষ নিমজ্জিত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকিতেন।

এই সময়ে কলেজে একটি ঘটনার দরুণ তাঁহার নাম ছাত্রমহলে ছড়াইয়া পড়িল। প্রেসিডেন্সী কলেজে ওটেন নামে এক ইংরাজ-অধ্যাপক একদিন বাঙালীদের উপহাস করিয়া লাঞ্ছনাকর উক্তি করেন। তাহার জন্য কলেজের সব ছাত্রই তাঁহার উপর চটিয়া যায়। একদিন ওটেন একটি ছেলেকে রূঢ়ভাবে অপমান করিলেন। সুভাষচন্দ্র সে-অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন এবং একদিন কয়েকজন ছাত্র ষড়যন্ত্র করিয়া কলেজের মধ্যে ওটেনকে প্রহার করিল। সেই দলের নায়করূপে সুভাষচন্দ্রের নামই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত হইল এবং শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। পরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছায় তিনি পুনরায় ছাত্র-হিসাবে পড়িবার অধিকার পাইলেন। সসম্মানে বি-এ পাশ করিয়া তিনি বিলাতে সিভিল সার্ভিস পড়িবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরের মধ্যে তখন হইতেই দেশের পরাধীনতার জ্বালা তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রকারে নিজেকে উপযুক্ত করিয়া লইয়া তিনি দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। তাই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বেচ্ছায় যখন সেই পরীক্ষার ফলস্বরূপ উচ্চ-রাজপদ প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলেন। কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতেই তিনি তাঁহার জীবনের পথ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই পাঠ্যজীবনের সর্ব্বোচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিবার লগ্ন আসিল, তিনি স্বেচ্ছায় সুকোমল

কুসুমাস্তীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া কণ্টকাকীর্ণ দেশ-সেবার পথ গ্রহণ করিলেন। বিলাত হইতে জাহাজে অবতরণ করিয়াই সোজা মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং দেশ-নায়কের নিকট নিজেকে সম্প্রদান করিলেন। সেইদিন হইতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার যে-আত্মিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, ঝড-ঝঞ্ঝা, বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়াও তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে দেশবন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দেন।

বাংলাদেশে পদার্পণ করিয়াই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এতদিন মনে মনে যে-গুরুর অনুসন্ধান করিতেছিলেন, দেশবন্ধুর মধ্যে সেই গুরুর দর্শন পাইলেন। দেশবন্ধুও তাঁহাকে পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে, সহকর্ম্মীরূপে পার্শ্বে টানিয়া লইলেন। দেশবন্ধু যতদিন জীবিত ছিলেন, সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত। দেশবন্ধুর প্রভাবেই সুভাষচন্দ্রের কর্ম্ম-জীবনের সূচনা হয়।

বাংলাদেশ সর্ব্বপ্রথম সুভাষচন্দ্রকে কর্ম্মীরূপে চিনিল, সংবাদপত্র গঠনের মধ্য দিয়া। দেশের মধ্যে যে নব-জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাকে স্থায়ীমূর্ত্তি দিবার জন্য দেশবন্ধু ইংরাজী এবং বাংলা দৈনিক কাগজ বাহির করিলেন। বাংলার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে লিবার্টি এবং ফরোয়ার্ডের দান অক্ষয় হইয়া আছে। সুভাষচন্দ্র সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান-কর্ম্মীরূপে বাংলাদেশে সংবাদপত্র পরিচালনের ইতিহাসে যুগান্তর লইয়া আসিলেন। সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া তিনি দেশ-দেশান্তরের সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তুলিলেন। প্রত্যেক দেশের জাতীয় আন্দোলনকে তিনি দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিলেন। এই ভাবে বাংলার সেই যুগের তরুণদের সম্মুখে বিপ্লবী আয়ারল্যাণ্ড, মিশর, তুরস্ক, রুশ, সহযাত্রী-রূপে দেখা দিল। সুভাষচন্দ্র সেইসব দেশে নিজেদের প্রতিনিধি স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই ভাবে বাংলাদেশে সংবাদপত্র-পরিচালনের ব্যাপারে একটা নতুন যুগ দেখা দিল।

সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মশক্তির আরও স্পষ্ট প্রমাণ আমরা পাইলাম, যখন দেশবন্ধু তাঁহাকে কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম বাঙালী প্রধান-কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। কলিকাতা করপোরেশন একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। বহুদিন হইতে এই প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরিক কর্ম্ম-প্রণালীর মধ্যে নানাজাতীয় বিশৃঙ্খলা এবং অনিয়ম দেখা দিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র কঠোর হস্তে সেই সমস্ত অনিয়ম দূর করিয়া একটা বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা এবং তৎপরতা দেখিয়া বড় বড় সিভিলিয়ান সাহেবরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু একাদিক্রমে বেশীদিন সেই আসনে তিনি থাকিতে পারিলেন না। শীঘ্রই কারাগারের আহ্বানে তাঁহাকে সাড়া দিতে হইল।

সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, কলিকাতা কংগ্রেসের সময় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন। সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় এবং সামরিক বেশভূষায় তিনি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-দলকে গঠন করিলেন। তিনি স্বয়ং সেনাপতির পোষাকে তাহাদের কমাণ্ডিং অফিসর হইলেন। কলেজে পড়িবার সময় তিনি যথারীতি সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শিক্ষাকে কাজে লাগাইয়া সেই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। তখন অনেকেই তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়াছিল কিন্তু তিনি স্বভাবতঃই অতি গম্ভীর-প্রকৃতির এবং মৌনী ছিলেন। তাই সাধারণের ব্যঙ্গ বা প্রশংসায় উত্তেজিত হইতেন না। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন যখন কালক্রমে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল, তখন আমরা সকলেই বুঝিতে পারিলাম, সেদিনকার সেই সমরসজ্জা তাঁহার নিকট সামরিক বিলাসের সামগ্রী ছিল না।

দেশবন্ধু যখন পরলোকগমন করিলেন, তখন তিনি দূর মান্দালয়-জেলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ। সেই কারাবাসের মধ্যে যখন সেই নিদারুণ সংবাদ গিয়া পৌঁছাইল, বেদনায় তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এই

মান্দালয় জেল হইতে তিনি যে-কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রগুলি বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। তাঁহার কতখানি রচনাশক্তি ছিল, এই পত্রগুলি তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু আসল কথা হইল, এই পত্রগুলির বিষয়-বস্তু। এই পত্রগুলির প্রতিছত্রে বাংলা-দেশের প্রতি যে-ভালবাসা উচ্ছল হইয়া উঠিল, জগতের সাহিত্যে তাহা স্থান পাইবার যোগ্য। এবং তাহার মধ্য হইতে বোঝা যায়, কি তীব্র-ভাবেই না তিনি বাংলাদেশকে ভালবাসিতেন।

এই দীর্ঘ কারাবাসের ফলে যখন তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, এমন কি মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিল, তখন বাধ্য হইয়া ভারত-সরকার তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। রোগশীর্ণ দুর্ব্বল দেহ লইয়া ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি পাঞ্জাবের ডালহাউসী পাহাড়ে কিছুদিন বিশ্রামের জন্য রহিলেন। কিন্তু শরীর সারিতে না সারিতেই আবার কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ডাক্তারেরা নিষেধ করিলেন। কিন্তু সে নিষেধ মানিবার মত মনের অবস্থা তখন তাঁহার ছিল না। দেশের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তখন শতশিখায় তাঁহার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বেশীদিন সেই ভার রোগজীর্ণ দেহ সহ্য করিতে পারিল না। বারবার কারাবাসের ফলে মারাত্মক যক্ষ্মা-রোগের বীজ দেহকে আক্রমণ করিয়াছে, তিল তিল করিয়া ভিতর হইতে সর্ব্বশক্তি চুষিয়া লইতেছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সমানভাবেই তিনি কর্ম্ম করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া আসিল। এই অবস্থায় তিনি বিনা-বিচারে পুনরায় কারারুদ্ধ হইলেন, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য। তাঁহার জীবনের জন্য দেশবাসী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তখন ভারত-সরকার তাঁহাকে এক সর্ত্তে কারামুক্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন, যদি তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান

অগত্যা বাধ্য হইয়া রুগ্ন অসুস্থ দেহে তিনি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিবসে নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য য়ুরোপ যাত্রা করিলেন। যাত্রার প্রাক্-কালে তাঁহার অন্তর হইতে বাণী জাগিযা উঠিল, "বাংলা মরিলে কে বাঁচিযা থাকিবে? বাংলা বাঁচিলে কে মরিবে?"

বাংলার এই সুনিশ্চিত ভবিতব্যতার চরম আশ্বাস লইযা তিনি দীর্ঘ তিন বৎসব কাল য়ুরোপে প্রবাস-জীবন যাপন করেন। মধ্যে একবার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কযেকদিনের জন্য দেশে আসেন। গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ দেশ ছাড়িযা চলিযা যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। বাধ্য হইযাই তাঁহাকে স্বদেশ ছাড়িযা চলিযা যাইতে হইল।

এই সময য়ুরোপে প্রবাসে ভারতের এক রণক্লান্ত সৈনিক জীবনের শেষ-অবসর যাপন করিতেছিলেন, বিঠলভাই প্যাটেল। এই গুর্জ্জর-সিংহের শেষ-দিনগুলি সুভাষচন্দ্র সেবা এবং ভক্তি দিযা সুন্দব করিযা রাখেন। সুভাষচন্দ্রের ক্রোড়েই তিনি দেহত্যাগ করেন এবং দেশের সেবায তাঁহার সমস্ত অর্থ সুভাষচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিযা যান।

দীর্ঘকাল স্বদেশ ত্যাগ করিযা থাকার ফলে, তাঁহাব অন্তর চঞ্চল হইয়া উঠিযাছিল। স্বদেশের মাটীতে পা দিযা দাঁড়াইবার জন্য তাঁহার সর্ব্বদেহ যেন চীৎকাব করিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে স্থির করিলেন, প্রবাসে এই ভাবে বন্দীজীবন যাপন করার চেযে, স্বদেশেব কারাগারে মৃত্যুও ভাল। তিনি জানিতেন, ভারতবর্ষে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুনরায় আবার বিনা-বিচারে কারারুদ্ধ হইবেন কিন্তু স্থির করিলেন, সেই ভবিতব্যতাই তিনি বরণ কবিয়া লইবেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি বম্বে শহরে জাহাজ হইতে পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকার তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। গভর্ণমেণ্ট এক কারাগার হইতে অন্য কারাগারে বন্দী ব্যাঘ্রের মত তাঁহাকে লইয়া ফিরিতে লাগিলেন। ক্রমান্বয় কারাবাসে

যেটুকু স্বাস্থ্য উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাও বিনষ্ট হইয়া গেল। পুনরায় জ্বর দেখা দিতে লাগিল

এই ভাবে কারাবাসে আর দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে প্রায় ছয় বৎসর কারাবাসের পর পুনরায় মুক্ত হইলেন। মুক্ত হইয়াই তিনি কংগ্রেসের পরিচালনের ভার স্বীয় স্কন্ধে লইলেন অথবা দেশবাসী সেই সম্মানের আসনে তাঁহাকে বসাইল। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি দেশবাসীকে নূতন কর্ম্ম-ব্যবস্থার আহ্বান জানাইলেন। পরের বৎসর ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁহার কর্ম্ম-প্রণালী লইয়া কংগ্রেসের পুরাতন নায়কদিগের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য দেখা দিল। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিপক্ষ-দলে দাঁড়াইলেন। কিন্তু তিনি যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, কোন ব্যক্তিত্বের নিকট তাহা বিসর্জ্জন করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমশঃ এই মনোমালিন্য তীব্র আকার ধারণ করিল। মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন কিন্তু যখন বুঝিলেন কংগ্রেসের প্রাচীন কর্ম্মীরা তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিতে সম্মত নন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় সভাপতিত্ব ত্যাগ করিলেন এবং নিজের কর্ম্মপন্থা-অনুযায়ী একটি নূতন দল গঠন করিলেন। এই দলেরই নাম ফরোয়ার্ড ব্লক। কংগ্রেস তাঁহার এই আচরণের জন্য তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিলেন। তিনি নীরবে এই শাস্তি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চির-বিদ্রোহী অন্তর তখন আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছিল। যেদিন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের অহিংস-নীতি গ্রহণ করেন, সেদিনও তিনি অন্তরের অন্তরতম বিপ্লববাদে আস্থা হারান নাই। কংগ্রেসের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে ক্রমশঃ সশস্ত্র বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর গোপনে তিনি একমাত্র মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার এই

অন্তরের বাসনার কথা নিবেদন করেন। এই দুই জন-নায়কের মধ্যে বহু বাদানুবাদ হয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কোনমতেই তাঁহার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিলেন না। তখন মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, "সশস্ত্র বিপ্লবে যদি তুমি কৃতকার্য্য হইতে পার, তাহা হইলে জানিবে, সবচেয়ে বেশী সুখী আমিই হইব।" এই ভাবে পরোক্ষভাবে তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া সুভাষচন্দ্র অতি-গোপনে এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিতে থাকেন। তখন কেহই এই ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও সন্দেহ করিতে পারে নাই। অবশেষে একদিন সকলে বিস্মিত হইয়া শুনিল যে, সুভাষচন্দ্র তাঁহার এলগিন রোডের বাড়ী হইতে গুপ্তচরদের চক্ষুতে ধূলা দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এলগিন রোডের বাড়ীতে তিনি সন্ন্যাসীর মত জীবন-যাপন করিতেন। কাহারও সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতেন না। এমন কি তাঁহার ঘরে তাঁহার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদেরও যাইবার অনুমতি ছিল না। সকলেই অনুমান করিয়াছিল, হয়ত তিনি এইবার সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এই দুরন্ত বিপ্লবী সেই সময় লোকচক্ষুর আড়ালে নিজের পলায়ন-ব্যবস্থার সমস্ত আয়োজন করিতে-ছিলেন। আফগানী মুসলমানের বেশে তিনি আফগানিস্তান দিয়া রাশিয়ায় যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইতালীয়ান রাজদূতের সহায়ে অবশেষে তিনি বার্লিনে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র হিটলারের সহিত দেখা করিয়া ভারত-আক্রমণের জন্য একটি স্বতন্ত্র সৈন্য-দল গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

সেই সময় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপান ইংরাজদের বিতাড়িত করিয়া সিঙ্গাপুর দখল করিয়া লয়। স্বনামখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া জাপানে বসবাস করিতেছিলেন। জাপানীদের সাহায্যে ভারত-আক্রমণের জন্য তিনিও একটি সেনাদল

গঠন করিয়াছিলেন কিন্তু উপযুক্ত নায়কের অভাবে এই দল শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই। সুভাষচন্দ্র বার্লিন হইতে সিঙ্গাপুরে আসিয়া এই নূতন সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় একটা নব-জীবনের সাড়া পড়িয়া গেল। দলে দলে নরনারী তাঁহার নব-গঠিত আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের পতাকার তলায় সমবেত হইতে লাগিল। ধনী তাহার সর্ব্বস্ব দান করিল, গৃহস্থ নিজেকে দান করিল, এমন কি নারীরাও অগ্রসর হইয়া আসিল। সুভাষচন্দ্রের গলার একগাছি ফুলের মালার দাম লক্ষ টাকা নীলামে উঠিল। এই একটি লোকের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা যেন দিব্যমূর্ত্তিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। হিন্দু ও মুসলমান নিঃশেষে সব সাম্প্রদায়িক ভেদ ভুলিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। এতদিন ভারতবর্ষে যাহা সম্ভব হয় নাই, এই ঐন্দ্রজালিক তাঁহার অপরূপ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাহা সম্ভব ও সত্য করিয়া তুলিলেন, হিন্দু, শিখ, মুসলমানদের লইয়া একটি সঙ্ঘবদ্ধ এক-জাতি। একই উদ্দেশ্যে, একই পথে, একই পতাকার তলে তাহারা সমবেত হইল।

সিঙ্গাপুর হইতে সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের নব-রাষ্ট্রের সংবাদ জগতে ঘোষণা করিলেন। তিনিই হইলেন সেই নব-রাষ্ট্রের প্রথম সভাপতি এবং যথারীতি সেই রাষ্ট্রের মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিলেন। এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের নায়করূপে তিনি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

আজাদ-হিন্দ্-বাহিনীর প্রধান-সেনাপতিরূপে তিনি বাহিনীর সঙ্গে বর্ম্মায় আসিলেন এবং বর্ম্মার সীমান্ত দিয়া ভারত-আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে মিত্র-শক্তির সৈন্যদের পরাজিত করিয়া তিনি ভারতবর্ষের মাটীতে পদার্পণ করিলেন এবং কোহিমার প্রান্তরে স্বাধীন-ভারতের পতাকা প্রোথিত করিলেন। লক্ষ্য, দিল্লী—দিল্লীর রাজ-প্রাসাদের চূড়ায় স্বাধীন-ভারতের এই বিজয়-পতাকা প্রোথিত করিতে হইবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিদারুণ বর্ষা নামিয়া আসিল। সেই সঙ্গে আমেরিকানদের আক্রমণে জাপান বিপন্ন হইয়া পড়িল। যুদ্ধের যে প্রয়োজনীয় উপকরণ জাপানের নিকট হইতে পাইবার কথা ছিল, তাহা জাপান সরবরাহ করিতে পারিল না। দলের মধ্য হইতে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রু-পক্ষকে আজাদ-হিন্দের সৈন্য-সংস্থানের খবর দিয়া দিল। ফলে আজাদ-হিন্দ্-বাহিনী ক্রমশঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। সুভাষচন্দ্র যখন বুঝিলেন যুদ্ধে জয়লাভের আর আশা নাই, তখন তিনি সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করিবার আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং শত্রু-ব্যূহের মধ্য দিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন।

কিন্তু কিছুদিন পরে রয়টার এক সংবাদে জানাইল যে ফরমোসা দ্বীপের নিকট এক বিমান-দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই সংবাদে প্রত্যেক ভারতবাসী মুহ্যমান্ হইয়া পড়িল। যে-সংগ্রামের জন্য তিনি জীবন পণ করিয়াছিলেন আজ সে-সংগ্রামে ভারতবর্ষ জয়ী হইয়াছে কিন্তু যাঁহার জন্য সেই বিজয় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, সেই সেনা-নায়ক আজ কোথায়?

প্রত্যেক ভারতবাসী আজ বিশ্বাস করে যে, একদা শ্বেত-অশ্বের উপর সওয়ার হইয়া, হস্তে ভারতবর্ষের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা লইয়া সুভাষচন্দ্র পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন...অরণ্য হইতে ফিরিয়া আসিবে শিকারী, সমুদ্র হইতে ফিরিয়া আসিবে নাবিক, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিবে সৈনিক। ঊর্দ্ধ-আকাশের দিকে নিয়ত এই প্রার্থনা উঠিতেছে... জাতির অন্তরের এই প্রার্থনা কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে একমাত্র মহাকাল।